KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৫৪ আশ্বিন, ১৩৫৪ কার্তিক, ১৩৫৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

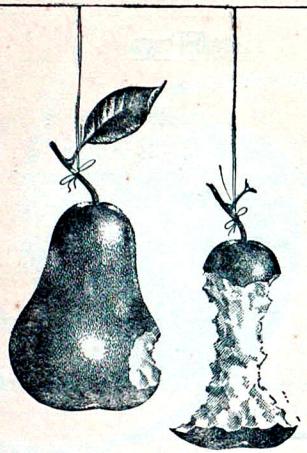

দেখে পরখ - আর চেখে পরখ...

অনেক জিনিষ আছে যা বাইরে থেকে দেখে পরখ করতে গেলে ঠকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন ফল। বাইরে থেকে দেখে মনে হোল বেশ সরেস, কাটার পর দেখা গেল ভেতরে পোকায় খাওয়া। সেই জন্যে ফল কেনার সময় চেখে পরখ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সাবান বা অন্যান্য মোড়কের জিনিষ পরখ করা যায় কি করে? এর একটি নিশ্চিত উপায় বুদ্ধিমান দোকানদারদের জানা আছে—তাঁরা দেখেন জিনিষটির নামটি পুরোপুরি বিশ্বাস-যোগ্য কিনা এবং সেটি এমন মার্কার জিনিষ কিনা যা তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

প্রায় ৭০ বছর ধরে জনসাধারণ হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থাবান কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই জিনিষগুলির গুণাগুণের কোন তারতম্য হয়নি। এই জিনিষগুলির ওপর তাঁদের আস্থার আর একটি কারণ, এগুলি বাজারে ছাড়বার আগে আমরা পরখ করে তবেই ছাড়ি।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী আমাদের সব জিনিষের ওপর—কাঁচা মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত, আমরা পরীক্ষা চালাই। এ ধরণের পরীক্ষা চলে প্রতি সপ্তাহে সংখ্যায় ১২০০। আমরা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিই যে এ জিনিষগুলি সব রকম আবহাওয়াতেই চালান এবং মজুদ করা যাবে। আমাদের পরীক্ষাগারে 'কৃত্রিম আবহাওয়া' সৃষ্টি করে আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন আবহাওয়াতে এ জিনিষগুলি কেমন থাকে। আপনারা বাড়ীতে এ জিনিষগুলি যে রকম ব্যবহার করে পরখ করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে এইগুলি পরখ করে দেখে নিই। আমাদের তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—লাইফবয় সাবান, ডালডা বনস্পতি, গিবস্, এস আর টুথপেষ্ট অর্থাৎ সবগুলিই আপনাদের পরিচিত জিনিষ। এই জিনিষগুলির এত সুনাম কারণ এই জিনিষগুলি বিশ্বাস-যোগ্য। কঠিন পরীক্ষা চালানোর পর বাজারে ছাড়া হয় বলেই এগুলি সর্ব-সাধারণের এত বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।

HINDUSTAN LEVER LIMITED · THE SEAL OF QUALITY

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 5-X52 BG

সমকালীন

প ঞ্চ ম ব র্ষ ঃ আ শ্বি ন ১ ৩ ৬ ৪

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ঃ বিনয় ঘোষ ৩৫৩

আত্মজীবনী ঃ সোমেন বসু ৩৭০

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের ইতিকথা ঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৭৪

শঙ্করের বিবর্তবাদ ও সৎকারণবাদ ঃ রমা চৌধুরী ৩৭৯

ভাষাতত্ত্বে—শব্দকথা ঃ ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৮৩

বৌদ্ধ সাধনা ঃ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮৬

অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য ঃ চিন্তামণি কর ৩৬২

ক বি তা ॥ আশ্বিন আকাঙ্খা ঃ সন্তোষ দাস ৩৯৩

পারাবত ঃ বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৩৯৪

ছায়া ঃ গোবিন্দ ভট্টাচার্য ৩৯৫

মৃত্যুর অতীত ঃ শ্যামাদাস সেনগুপ্ত ৩৯৬

গ ল্প ॥ প্রতিশোধ ঃ সরিৎশেখর মজুমদার ৩৯৭

সহৃদয় হৃদয় ঃ সুশীল রায় ৪০৫

আ লো চ না ॥ ঊর্ধ্বতির আতঙ্ক ঃ রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত ৪১৩

বর্তমান রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কিকার প্রভাব ঃ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৪১৫

স মা জ স ম স্যা ॥ বিরিঞ্চি বাবা প্রসঙ্গে ঃ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪১৮

গ্র ন্থ প রি চ য় ॥ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ঃ ভবতোষ দত্ত ৪২১

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা বোম্বাই নিউ দিল্লী আসানসোল

পঞ্চম বর্ষ

স
ম
কা
লী
ন

আশ্বিন ১৩৬৪

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শও হিউম্যানিস্টের আদর্শ। তিনি নিজে ছিলেন 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যার সাধক, তাই তাঁর শিক্ষার আদর্শেরও ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজ্‌ম। সেই জন্যই দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও, নবযুগের হিউম্যানিস্ট আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী করে তোলেনি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনঃচর্চার আবশ্যকতা তিনি অস্বীকার করেন নি কখনও, কিন্তু চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং নিজে তা পরিবর্তন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক এবং সেখানে অতীতের সঙ্গে কোন আপস-রফা তিনি করেন নি। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় বিদ্যার সমন্বয় তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু বিদ্যার্জনের ও বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতির কোনরকম মিশ্রণ কোনকালেই তাঁর কাম্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই দিক দিয়ে মনেপ্রাণে একজন "ইয়োরোপীয়" শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কোন ভাবে গোঁজামিল বা মনের সংশয় ছিল না। 'হিউম্যানিজম' অবশ্যই তার মূল উৎস ছিল। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে তিনি যতদূর সম্ভব এদেশের শিক্ষাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণাকেন্দ্র। শাস্ত্রকার নয়, পুরোহিত নয়, গুরু নয়, পণ্ডিত নয়, সবার উপরে 'মানুষ' গড়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুখীন শিক্ষানীতির প্রবর্তকরূপে বিদ্যাসাগর আজও শিক্ষাকেন্দ্রে 'একক' স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষায়তনকে তিনি মানবধর্মের 'নার্সারী' করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকালের চতুষ্পাঠী, আশ্রম বা সাম্প্রতিক-কালের ডিগ্রী-উৎপাদনের কারখানা করতে চাননি। তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ সত্য হয়নি, তাঁর পরিকল্পনাও অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তা সব দেশেই হয়েছে, কেবল এদেশে হয়নি। কোন দেশে কোন কালে, কোন আদর্শবাদীর স্বপ্নই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। উনিশ শতকের অনেক আদর্শ ও স্বপ্ন যেমন আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, অবহেলিত ও বিকৃত, শিক্ষাব্রতীদের আদর্শও তেমনি অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত। কিন্তু তাই বলে তাঁদের শিক্ষা-

দর্শের বা শিক্ষা-পদ্ধতির কোন সামাজিক সুফল ফলেনি, এমন কথা বলা সংগত নয়। গত একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে, সামাজিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তা শিক্ষার প্রসার ভিন্ন হত না। উনিশ শতকের অনেক শিক্ষাব্রতী শিক্ষার এই প্রসারের কলাকৌশলের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁদের অনেকে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ছিলেন। বাংলা-দেশে থেকেও বিদ্যাসাগর তাঁদের শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁদের চিন্তায় ও আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তার মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য, তা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সংঘাতই শিক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে তো বটেই, বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গেও। তার মধ্যেও তিনি যতটুকু শিক্ষাসংস্কার করতে পেরেছিলেন, তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্ গড়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষাব্রতীদের আদর্শ ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, কোথাও তা লেখা নেই। তার প্রমাণও কোন দলিলপত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কারের ধারা, রীতি ও পদ্ধতি বিচার করলেই বোঝা যায়, একশ বছর আগে হঠাৎ একদিন এসব তিনি চিন্তা করে ফেলেননি। বিশেষর, বিশেষ করে ইয়োরোপের, সমকালীন শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথাও ছিল নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে? সন্ধান পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে। 'বিখ্যাত গ্রন্থাগার' বলছি, কারণ তখনকার দিনে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের আগ্রহ এবং গ্রন্থপ্রীতির আতিশয্য সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের আজও যে অবশেষ রয়েছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে', তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এই যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌতূহলী হয়ে এই গ্রন্থসংগ্রহ আমি নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম। দেখে, অনেক সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নানাদিক ছাড়াও, তাঁর কর্মজীবনের অনেক বিচ্ছিন্ন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর সংগৃহীত পুঁথিপত্র পুস্তকের মধ্যে। তাঁর জীবনের এই সবচেয়ে প্রিয় নিত্যসঙ্গীদের দিয়ে তাঁকে যেমন চেনা যায়, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই যায় না।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারে শিক্ষাবিষয়ে অনেক বই এখনও রয়েছে। অনেক বই নানা-বিপর্যয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে, নষ্টও হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যা রয়েছে, সূত্রসন্ধানের পক্ষে তাই যথেষ্ট। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সমকালে, ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের শিক্ষাব্রতীরা যেসব শিক্ষাসমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যে পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছিলেন, বিদ্যাসাগরের সংগৃহীত পুঁথিপত্র দেখে বোঝা যায়, তার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল অন্তরের, এবং তার প্রতি তাঁর কৌতূহলও ছিল অসীম। ইংলণ্ডে এই সময় জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, মডেল স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ ও আন্দোলন চলছিল। বিদ্যাসাগর যে এই শিক্ষাসংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে খুবই ওয়াকেব্‌হাল ছিলেন, তা তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তকসংগ্রহ থেকে বোঝা যায়। ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মডেল স্কুল, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক

সমসাময়িক কালের বই তাঁর সংগ্রহে আছে। অকারণে অর্থব্যয় করে তিনি নিশ্চয় সেগুলি সংগ্রহ করেননি। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে গেলেও, আজও এইসব বইয়ের 'মার্জিন'ে তাঁর হাতে-লেখা 'নোট' ও চিহ্নাদি দেখে বোঝা যায়, কত আগ্রহ নিয়ে এগুলি তিনি পড়তেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কারের ধারার সঙ্গে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবল পুঁথিপত্রের ভিতর দিয়েই এই পরিচয় ঘটেনি। এই সময় রাজকার্যে যে সব ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই নূতন শিক্ষাদর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁদের সংস্পর্শে এসেও বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাসংস্কারের কাজে অনেকটা উৎসাহিত হয়েছিলেন।

অনেকের ধারণা, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বেশী নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছিলেন। তা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রেও, তাঁর কালে, তিনি যে নির্ভীক মনো-ভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজকের দিনেও ভাবলে অনেকে অবাক হবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এবং 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবের' আদি রচয়িতা হয়েও, প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার যে কোন বিভাগের যাকিছু ভ্রান্ত সারশূন্য ও অপ্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছে, তা তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছেন সেই 'সংস্কৃত কলেজ' থেকেই তাঁর শিক্ষাসংস্কার শুরু হয়েছে। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে, সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে, তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে দাখিল করেন, এবং কলেজের অধ্যক্ষতাকালে, ১৮৫৩ সালে, বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন-রিপোর্টের উত্তরে যে সমালোচনা সংসদে পাঠান—তা বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে দুটি যুগান্তকারী দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য। দুঃখের বিষয় শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে যা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, বা করেছেন, তাঁরা এই দুটির আসল প্রতিপাদ্য নানা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান দেখা গেছে। তার কারণ তাঁদের ধারণা, বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিষয়ে যে-সব নির্ভীক মতামত এই দুটি রিপোর্টে ব্যক্ত করেছেন, তা আজও আমাদের বিশ্বৎসমাজের কাছে হয়ত 'চরম' বলে মনে হবে এবং তার প্রচার হলে তাঁর লোক-প্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এ-ধারণা, আমাদের মনে হয়, ভুল। বিদ্যাসাগর চরিত্রের উপলব্ধির দিন, বা তাঁর প্রকৃত লোকপ্রিয়তার দিন, আমাদের দেশে ও সমাজে এখনও আসেনি। তাঁর চরিতকার ও তথাকথিত ভক্তবৃন্দের বিকৃত ব্যাখ্যান ও ফিসফিসানির তলায় তাঁর প্রকৃত চরিত্র, সমাজ ও শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর আসল মতামত, আজও চাপা রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ভবিষ্যতের সমাজে, সত্যকার শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মানুষ, তাঁর চরিত্রের ও মতামতের ন্যায্য মূল্যায়নে সমর্থ হবে। তার আগে, আজকের মতন, তিনি অর্ধবিস্মৃত হয়েই থাকবেন।

দলিল দুটির কথা বলি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হবার একমাস আগে, শিক্ষাসংসদের কাজে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে পাঠ্যবস্তুর সংস্কার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করেন। যেমন ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে 'মুগ্ধবোধ' পাঠ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তা ছাড়া, 'Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries, is an imperfect grammar'. বাঙালী ছাত্ররা বাংলা-

ভাষায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়বে এবং তার সঙ্গে সুনির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য পাঠ করিয়ে সাহিত্যবোধ তাদের জাগাতে হবে। পরে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' পড়বে, কারণ "of all the Sanskrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject." এরকম **সাহিত্য অলঙ্কার জ্যোতিষ** ইত্যাদি বিষয়ের প্রচলিত বহু পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তিনি সমালোচনা করেছেন। **সাহিত্যের পাঠ্য** শ্রীহর্ষের 'নৈষাধচরিত' সম্বন্ধে বলেছেন—'Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste; there are occasional bursts, however, of fine passages.' সুতরাং তার নির্বাচিত অংশ পড়লেই যথেষ্ট। **অলঙ্কারের পাঠ্য** 'সাহিত্যদর্পণ' ও 'কাব্যপ্রকাশ' সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of Rhetoric." সুতরাং সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যাদর্শন ও রসগঙ্গাধরের বদলে কেবল কাব্য-প্রকাশ ও দশরূপক পাঠ্য হওয়া উচিত। **জ্যোতিষ** সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ছাত্রেরা এখন ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও বীজগণিত' পড়ে, কিন্তু বই দুটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথেষ্ট নয় এবং তাদের পদ্ধতিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া, অকারণে বিষয়বস্তুকে জটিলও করা হয়েছে, নিয়মকানুনে প্রশ্ন সব কাব্যে লেখা হয়েছে। চার বছরে ছাত্রেরা বই দু'খানি পড়ে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু শেখে না। সুতরাং জ্যোতিষশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের আগাগোড়া পরিবর্তন করতে হবে। ভাল ভাল ইংরেজী পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক থেকে অবিলম্বে তিনখানি পাঠ্যবই সংকলনের প্রয়োজন। এগুলি পড়বার পর ছাত্রেরা লীলাবতী ও বীজগণিত পড়তে পারে। Higher Mathematics-এর বই পরে অনুবাদ করে পাঠ্যপুস্তক করতে হবে। Astronomy সম্বন্ধে, আমার মনে হয়, হার্শেলের বই অবলম্বন করে বাংলাভাষায় একখানি পাঠ্য-পুস্তক লেখা উচিত। ইংরেজী বই পড়লেও চলত, কিন্তু বাংলাভাষায় লিখতে পারলে অন্যান্য অনেক বাংলা স্কুলেও এ-বই পাঠ্য হতে পারে।" **স্মৃতিশাস্ত্র** সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "মনুসংহিতা" হিন্দু বিধিবিধানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কারণ "It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a mannar an index of Hindu Society in ancient times." সুতরাং মনু অবশ্যপাঠ্য। বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' Civil ও Criminal Law—সম্বন্ধে 'is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Provinces,' তাই মিতাক্ষরাও পড়তে হবে। বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামনি' বিহার প্রদেশে প্রচলিত। তাও পড়া উচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' তো পড়তেই হবে। 'দত্তক মীমাংসা' ও 'দত্তক চন্দ্রিকা' দত্তক গ্রহণ ও দত্তকের অধিকারাদি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মীমাংসা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য, 'চন্দ্রিকা' বাংলাদেশের জন্য। 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' রঘুনন্দন বিরচিত, কিন্তু এর মধ্যে কেবল 'দায়' ও ব্যবহার এই দুটি তত্ত্ব ছাড়া বাকি ২৬টি তত্ত্ব ধর্মানুষ্ঠানের তত্ত্বকথা। সুতরাং 'the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued.' কারণ 'Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course.' **ন্যায়শাস্ত্র** প্রসঙ্গেও তিনি পাঠ্যবিষয় ও পণ্ডিতদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।

অনুমানচিন্তামনির' লেখক গঙ্গেশোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলেছেন ঃ 'His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle-ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a 'cobweb of learning.' শ্রীহর্ষের বিখ্যাত 'খণ্ডন' সম্বন্ধে বলেছেন—'The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call 'muddy metaphysics'." অবশেষে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে 'ন্যায়ের' বদলে এই শ্রেণীর নাম 'দর্শনশ্রেণী' রাখা হোক। দর্শনবিদ্যার অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই বলে তিনি শেষ করেছেন ঃ "True it is that the most part of the Hindu System of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanskrit Scholar their knowledge is absolutely required." এই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে, "ছাত্রেরা যখন দর্শন-শ্রেণীতে পড়বে তখন ইংরেজীও এতটা অন্তত শিখতে পারবে যাতে আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের বই পড়তে তাদের কষ্ট হবে না। তাহলে আমাদের ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনা করা বা পার্থক্য বিচার করাও তাদের পক্ষে সহজ হবে। এই সব সুশিক্ষিত ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন হিন্দু দর্শনের ভুলভ্রান্তি বা অযুক্তি প্রমাণ করা যত সহজ হবে, কেবল ইয়োরোপীয় দর্শন পাঠ করে তা সম্ভব হবে না। সবরকমের দর্শন আমি ছাত্রদের পড়াতে চাই, কারণ তা না পড়লে বিভিন্ন মতের দার্শনিকেরা কি ভাবে পরস্পরের মতামত ও যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন, তা তারা জানতে পারবে না। তা না জানলে, কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য, আর কোন্‌টা বর্জনীয়, তাও তারা বুঝতে পারবে না। তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় দর্শনে জ্ঞান থাকলে এই বিচারবুদ্ধি তাদের আরও সজাগ হবে।"

এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে এই রিপোর্টেই বিদ্যাসাগর তাঁর সুচিন্তিত মতামত নির্ভয়ে ব্যক্ত করেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনান্তে যে রিপোর্ট দেন, তার উত্তরের মধ্যেও বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম রিপোর্ট আর দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় উত্তরের মধ্যে তাঁর বক্তব্য স্বভাবতঃই আরও সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। ব্যালান্টাইন বিশপ বার্কলের 'Inquiry' গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে অনুমোদন করেন। বিদ্যাসাগর তা বাতিল করেন। বাতিলের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি কি তা জানবার আগে, বার্কলে সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলা দরকার, কারণ বার্কলে প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশপ বার্কলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক। তাঁর মতে, বাইরের বস্তুজগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, মানসলোকে তার প্রতিফলিত রূপই 'সত্য'। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, চেতনাই সত্য। এই চেতনায় ঈশ্বর। এই ভাববাদী দর্শন শিক্ষার জন্য কোন ভারতীয়ের প্রয়োজন নেই বার্কলের কাছে দর্শন সম্বন্ধেও। ছাত্রদের তা গেলানোরও আবশ্যকতা নেই। আর তাতে কোন্ উদ্দেশ্যই বা সফল হবে? বিদ্যাসাগর তাই ব্যালান্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে লিখলেন ঃ "বার্কলের Inquiry পাঠ্য হলে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই বেশি। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। এখানে সে-সব কারণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, সে-সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নেই। মিথ্যা

হলেও অবশ্য হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতেই হবে, তখন ছাত্ররা যাতে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য ইংরেজীতে যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলে পড়িয়ে লাভ কি? বার্কলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মতন একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। ইয়োরোপেও এখন আর তা খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই বার্কলে পড়িয়ে কোন সুফল লাভের আশা নেই।"—এই হল বিদ্যাসাগরের যুক্তি। যেমন স্পষ্ট, তেমনি নির্ভীক। কোন ধোঁয়া নেই, বাঁকচাতুর্যও নেই। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ যে কতখানি মানবমুখীন তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়।

ব্যালান্টাইন তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন: "এখন এমন এক শ্রেণীর লোক গড়ে তোলার দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে, উভয় দেশের পণ্ডিতদের মতের ঐক্য খুঁজে বার করবেন, এবং ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করবেন।" ব্যালান্টাইনের এ-যুক্তি যে কতখানি হাস্যকর, একটু চিন্তা করলেই তা বোঝা যায়। আসলে শিক্ষার স্বার্থে নয়, বৃটিশ শাসনের স্বার্থেই তিনি এই 'সামঞ্জস্য' স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বার্কলের দর্শন পাঠ্য করতে চাওয়ারও সেই উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজরা তখনও এদেশে প্রগতিশীল দর্শন বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে ভয় পেতেন। এ দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় খুব বেশি হস্তক্ষেপ করতেও তাঁরা চাইতেন না। সেকালের পণ্ডিত-গোষ্ঠীরও বিরাগভাজন হওয়া তাঁদের কাম্য ছিল না। তাই ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের হাস্যকর সামঞ্জস্যের কথাও তাঁরা কল্পনা করেছেন। কিন্তু দূরদর্শী বিদ্যাসাগরের কাছে এই ফাঁকা বুলির অযৌক্তিকতা ধরা পড়েছে। তিনি ব্যালান্টাইনের 'সামঞ্জস্য'-সাধন প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছেন এই বলে: "আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাতে পারব।..সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে, পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিচিত্র মনোভাব দেখা দিচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে যার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখানো বা চিন্তা করা দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের অন্ধবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। 'সবই শাস্ত্রে আছে' এই কথা ভেবে তাঁরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অতএব এই পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক তৈরী করবার কল্পনা করে লাভ নেই। তাঁদের তোষণ করার নীতিতেও কোন ফল হবে না। তাঁদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই। আজ তাঁদের মর্যাদাও লুপ্তপ্রায়, তাঁদের তম্বিগম্বিতে বা আস্ফালনে ভীত হবারও কারণ নেই। ক্রমেই তাঁদের কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। পূর্বের সামাজিক আধিপত্য তাঁরা চেষ্টা করলেও আর ফিরে পাবেন না। বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেখানেই এই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের লোকের শিক্ষার আগ্রহও আছে যথেষ্ট। সুতরাং প্রাচীনপন্থী দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা না করে, দেশের নানা স্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে অনেক বেশী কাজ হবে বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের কথা না ভেবে, এখন দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করার দরকার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন একদল মানুষ গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা মাতৃভাষায়

পারদর্শী হবেন, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানী ও অনুরাগী হবেন এবং সবরকমের কুসংস্কার থেকে যাঁদের মন মুক্ত হবে। এই হবে শিক্ষকের গুণ। এই ধরনের মানুষ গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য, আমার সংকল্প। তার জন্য সংস্কৃত কলেজে আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা নিয়োগ করব। কলেজের পাঠ শেষ করে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা এই ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে। এ আশা মিথ্যা নয়।"

অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই আশার কথাটা হয়ত একটু বেশী করেই বলেছিলেন। কিন্তু যে মানবিক শিক্ষাদর্শের প্রবর্তক ছিলেন তিনি, তার রূপ-কল্পনায় তখন নৈরাশ্যের স্থান ছিল না।

বাংলা শিক্ষার প্রচলন, মডেল স্কুল স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন। তার বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই এখানে। তাঁর কীর্তির এই সুদীর্ঘ ক্যাটালগ রচনা করে তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের আদর্শ বোঝানো ততটা সহজ হবে না, যতটা পূর্বোক্ত দলিল দুটির প্রতিপাদ্য প্রকাশ করলে সম্ভব হবে। জানি না, আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই দুটি বিবরণীর মতন আর কোন 'দলিল' আছে কি না—যা চিন্তায় ও পরিকল্পনায় এত গভীর ও ব্যাপক, এত বলিষ্ঠ ও বিশ্বাবী, এত বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত। সমাজ-সংস্কারে যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি, তিনি সমান সংসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের পণ্ডিতসমাজের ভ্রূকুটির কথা ভেবে তিনি তাঁর শিক্ষাসংস্কারের সংকল্প থেকে এতটুকু বিচলিত হননি। প্রয়োজনবোধে তাঁদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতেও বাধা হয়েছেন। এমনকি সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের 'ভ্রান্তি' সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাও যে তিনি কতখানি বিচার করে, যাচাই করে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন, বার্কলের গ্রন্থ বাতিল করার যুক্তি থেকেই তা বোঝা হয়। ইংরেজরা সেকালের পণ্ডিতসমাজকে তোষণ করে চলতে চেয়েছিলেন, এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যা প্রগতিশীল চিন্তাধারার পোষক, তা এদেশে সহজে আমদানি করতে চাননি। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, সেকালের পণ্ডিতদের মন যুগিয়ে চলতে, বিদ্যাসাগর তা চাননি—এবং তাঁরা যা চাননি, বিদ্যাসাগর তাই চেয়েছিলেন, কেবল প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি এদেশের শিক্ষণীয় বিষয় করতে। তাও যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্যে। ব্যালান্টাইন প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতদের মতন তাই তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন বা ঐক্যের সন্ধান থেকে বিরত ছিলেন এবং তার 'বিপদ' সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। সেই বিপদ হল, 'সবই শাস্ত্রে আছে' মনে করার বিপদ, 'সবই বেদে আছে' এই মহানন্দময় চৈতন্যের সংকট। বিদ্যাসাগর বলেছেন, তখনই পণ্ডিতদের মধ্যে এই চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছিল, কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে। আজও, একশ বছরের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অগ্রগতির পর, এই চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাই না কি আমরা এদেশের বিশ্বৎ-সমাজে? বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এখনও সম্পূর্ণ জয় হয়নি, ব্যালান্টাইনদের আদর্শের প্রভাব এখনও যথেষ্ট রয়েছে। নবযুগের ইয়োরোপের 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের প্রবাহের পথ যাঁরা আমাদের দেশে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সেই ইংরেজরাই সেই আদর্শকে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের স্বার্থে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিকৃত করতে কুণ্ঠিত হননি। বিদ্যাসাগর সেই 'হিউম্যানিজ্‌মর' আদর্শের বীজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বপন

করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য সর্বপ্রথম দেশীয় বিদ্যার ঐতিহ্য থেকে এই আদর্শের পুষ্টির উপযোগী সার সংগ্রহ করার আবশ্যকতা তিনি যেমন বোধ করেছিলেন, তাঁর সমকালে আর কেউ তা করেননি। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের চারিদিকে যুগ-যুগ ধরে গজিয়ে-ওঠা বিষাক্ত আগাছা ও আবর্জনার প্রতি, কেবল ঐতিহ্যের মোহে, তিনি আকৃষ্ট হননি। নির্মমভাবে তা ছাঁটাই করেছেন, নির্মূল করারও চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের স্বর্ণকান্তিতে তিনি মুগ্ধ হননি, হিউ-ম্যানিজমের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করে, এদেশের মাটীতে 'transplant' করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের ভাষায় এই হিউম্যানিজমের মূলমন্ত্র হল—'Man is the measure of all things.' বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের একমাত্র মানদণ্ড ছিল 'মানুষ'। ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের উত্তরের উপসংহারে এই মানুষ গড়ে তোলার সঙ্কল্পই তিনি গভীর আবেগের ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

এই শিক্ষাদর্শকে বিদ্যাসাগর কিভাবে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন, সে-সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। ছাত্রদের যে তিনি ভালবাসতেন বা দরিদ্র ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন, সেটা খুব বড় কথা নয়। ছাত্রদের তিনি 'মানুষ' বলে মনে করতেন, সেইটাই বড় কথা। সেইজন্য শিক্ষকদের সব সময় তিনি নির্দেশ দিতেন, ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করতে। তাঁর পাঠশালা-জীবন থেকে তিনি দেখেছেন, সেকালের গুরুমশায়রা ছাত্রদের প্রতি কিরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাঁর সমবয়সী বন্ধু দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা) সেকালের এই গুরুমশায়-ছাত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনচরিতে লিখেছেন ঃ "তহানীন্তন গুরুমশায়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্টি গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত।...কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্য গুরুমহাশয় কোমল ভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষা বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।...ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যম স্বরূপ জ্ঞান করিত।" বিদ্যাসাগরের কালে এই ছিল শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক। বিদ্যাসাগর এই সম্পর্ককে মানবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকদের যম না ভাবে এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রদের অসহায় জীব না ভাবেন, মানুষ বলে মনে করেন, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ছাত্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, এরকম কোন শাস্তি বা নিষ্ঠুর আচরণের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাস শিক্ষকরা সহজে ছাড়তে পারবেন না জেনে, তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয় Metropolitan Institution-এর (শ্যামপুকুর শাখার) শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন ছাত্রদের প্রতি কোন অপমানকর ব্যবহার না করা হয়, অথবা তাদের কোনরকম দৈহিক দণ্ড না দেওয়া হয়। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে একবার ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একটি ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। সেই খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ হেঁটে বিদ্যালয়ে চলে যান এবং সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান

করে, প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করেন। প্রতিবেশীরা ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁকে সামান্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত না হতে অনুরোধ করেন। কয়েকজন শিক্ষক প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর বিচলিত না হয়ে তাঁদেরও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

ঘটনাটি এমনিতে 'লঘু ব্যাপারে গুরু সিদ্ধান্ত' বলে মনে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে ঘটনাটির যতখানি গুরুত্ব ছিল, ঠিক ততখানি গুরুত্বই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের দিয়েছিলেন। বিখ্যাত সুইস শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শের ফলাফল সম্বন্ধে বলা হয় ঃ 'Perhaps a more lasting effect of Pestalozzi's teaching was the elimination of repressive discipline and cruel and degrading forms of punishment from the common schools.' বিদ্যাসাগর পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শের কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে এ-সম্বন্ধে বইও আছে। পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তখন এদেশের শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে যে আলোচনা হত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থাগারে। কিন্তু পেস্তালৎসির কথা না জানলেও বা না শুনলেও, একথা নিশ্চয় বলা যায় যে বিদ্যাসাগরের মানবমুখীন শিক্ষাদর্শের পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় মানুষেরই মর্যাদা পেত, কলের পুতুল বলে গণ্য হত না॥

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্‌যাপিত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার তৃতীয় বক্তৃতা। দ্বারভাঙ্গা হলঘরে ৩১ জুলাই, ১৯৫৭, বুধবার প্রদত্ত। দ্বিতীয় বক্তৃতা 'সমকালীন' ভাদ্র সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রকাশিত হয়েছে।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

আমার লণ্ডনের ষ্টুডিয়োর দেওয়ালে লাগান ছিল অনেক বছর ধ'রে একটি পোর্‌সেলিনের পুরনো চীনা-প্লেট্‌। একদিন সেটার ধূলো ঝাড়তে গিয়ে অসাবধানে ঘা লেগে পেরেক খুলে প্লেট্‌টা পড়ল মাটিতে, আর ভেঙে হল শত খণ্ড। সেটা তো গেল কিন্তু রইল দেওয়ালে, যেখানে সেটা লাগান ছিল; একটা আবছা গোল দাগ। আমার অবর্তমানে তা আর বোধহয় নেই। নতুন মালিকের দেওয়া ডিস্টেম্‌পারে গিয়েছে হয়ত ঢাকা পড়ে—মুছে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। যতদিন দেওয়ালের গায়ে সে দাগটিকে দেখা যেত, মনে করিয়ে দিত হারানো জিনিসটির স্মৃতি। কেবল ফ্যাকাশে একখানা গোল ছাপ, যার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পেতাম, চলে-যাওয়া সেই নক্‌শাদার পুরনো চীনা প্লেট—গোলাবী, নীল, সবুজ আর হাল্‌কা হল্‌দে ফুলপাতা, ঝক্‌ঝকে সাদা গোলের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। ঐ ছোট স্থানটুকুর মধ্যে সে করে নিয়েছিল, দেওয়ালের সঙ্গে পরম সান্নিধ্য। তারা ছিল পাশাপাশি—গায়ে গায়ে অথচ হারিয়ে যায়নি একে অন্যতে। তাদের মধ্যে মিল ছিল, কিন্তু তারা মিশে যায়নি, আর সেই সান্নিধ্যের স্মারক হচ্ছে ঐ ছাপটুকু—দেওয়ালের সব জায়গার রঙের চেয়ে একটু ফিকে সে—জল থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আলোর মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

জীবনের দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে নিলে, এমনি কত ছাপ—কেউবা স্পষ্ট, কেউবা আব্‌ছা—মূর্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে কত চ'লে-যাওয়া স্মৃতি, কিছুটা রঙে, কিছুটা নক্‌শায়—কতগুলি হাইলাইটে ও কতগুলি স্যাডোয়।

আতলিয়ে

ব'জুর ব'জুর। সকাল ন'টা থেকে সওয়া ন'টা পর্যন্ত আতলিয়ে[১] ঐ শব্দে সরগরম। ম্যাসিয়ের [২] ষ্টোভে লাগিয়েছে গন্‌গনে আগুন। সারা রাত্তিরের জমা ঠাণ্ডা, তাপের ঠ্যালা খেয়ে কোণে কোণে থেমে যাবে কি-না যাবে ইতস্তত করছে। কোট খুলে ওভালঅল পরবার সময় মুহূর্তের সুযোগে আগন্তুকের স্বল্প উন্মুক্ত শরীরে প্রত্যাঘোন্মুখ ঠাণ্ডা লাগায় দু'একটা আচম্‌কা খোঁচা।

প্লোনের ওপর নগ্না মডেল, ষ্টোভের কাছে দাঁড়ানো থাকলেও তার গায়ে হংসচর্মবৎ গুটির বিস্তার দেখে বোঝা যায়, সেও এই প্রায়-বিতাড়িত ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পায়নি। বাইরের ইয়ার্ডেতে চৌবাচ্চায় রাখা ভিজে মাটি জমে কালো বরফ হ'য়ে গেছে। হাত-কোদাল দিয়ে তারই কয়েক তাল প্রত্যেকে নিয়ে আসছে। খানিক পরে আতলিয়েটা হয়েছে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সেই নীরবতা ভাঙে, মডেল-প্লোন ঘুরিয়ে দেবার শব্দে। একঘণ্টা পরে ম্যাসিয়ের বলে "রোপ্যো"।[৩] স্পন্দনহীনা মডেল, যে এতক্ষণ যেন যাদুতে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ

১। আর্টিস্টের কর্মশালা। ২। যেখানে ছাত্ররা কাজ করে তাদের তদারককারী। ৩। বিরাম।

ম্যাসিয়েরের ঐ মন্ত্রবাক্যে মায়াজাল ভাঙায় সে যেন ফিরে পেল তার নড়বার শক্তি। উঁচু করলো সে হাতদু'খানা। হাত না হয়ে পাখা হ'লে, মনে হ'ত সে যেন ডানা মেলে উড়ে যাবার প্রয়াসী। ঘাড়ের একদিকে মাথাটা হেলিয়ে, দিল একটা হাই। হাতের আড়াল দিয়ে হাই ঢাকবার ভান পর্যন্ত করল না। তারপর ধীরে তুল্‌ল একটি পা, নামলো অতি সন্তর্পণে প্লোন থেকে। পাশে চেয়ারে রাখা একটি ঝোলা গাত্রাবাস উঠিয়ে ঢেকে নিল নগ্ন শরীরের খানিকটা। একটু আগে সে ছিল রূপরাজ্যের সিংহাসন-আসীনা দেবী, যার আদল নিয়ে এতগুলি পিগ্‌মেলিয়ন গড়ছিল তাদের গ্যালাতিয়া। ম্যাসিয়েরের ঐ "রোপ্যো" শব্দেই সে পরিণত হল সাধারণ নগ্না নারীতে—তার এল লজ্জা, সে হ'য়ে গেল ঈভ্‌ আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকল তার উন্মুক্ত বক্ষ ও জঘন। চেয়ারের উপরে রাখা কাপড় স্তূপে হাত ডুবিয়ে বার করল একটি শাসালো এ্যাপেল এক ক্ষণমুহূর্তে চল্‌ল লোলাসক্ত জিহ্বা, দন্ত ও এ্যাপেলের কসাকসি। যে সব নরনারীর দল এতক্ষণ নিবিক্ষনমনে নীরবে গড়ছিল মূর্তি তারা হয়ে উঠল মুখর। আওয়াজে ভরে গেল সমস্ত আতলিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে জমিয়ে দিল কুয়াশা। চল্‌ল পরস্পরের মূর্তি নিরীক্ষন, বিচার ও মীমাংসা। শোনা গেল শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও ভাস্কররথীদের নাম—আরকেয়েক গ্রীক, এতুস্কান, বেনিন্‌; দোনাতেল্লো, ঘিবার্তী, রোক্কা, বুদের্শ, ব্রাঙ্কুসী এবং আরো কত কি। পনেরো মিনিট যেতেই ম্যাসিয়ের বল্‌ল "রোকমাসে মিল্‌ ভূা প্লে" আবার এসে গেল সেই নিস্তব্ধতা, প্রত্যেকে রত হ'ল তাদের গ্যালাতিয়ার গঠনে। ঈভ্‌ ফেলে দিল তার লজ্জাবসন—নগ্নারূপদেবী আরোহণ করলেন তাঁর বেদীতে।

একই মানুষ, একই চোখ, একই নগ্না নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্যাখে বিভিন্নভাবে। প্লোনের ওপর দণ্ডায়মানা উলঙ্গ দেহের ওপর ওঠা-নামা ক'রে চলেছে তাদের দৃষ্টি কিন্তু সে দৃষ্টি থেকে যায় না কোন স্থানে কামনার ভিড় দেখে। নিস্পৃহ নিষ্কাম রূপ-তাপসের দৃষ্টি সে, কেবল দেখছে আর গড়ছে।

বারটা বাজল। ম্যাসিয়ের আবার বল্‌ল, "রোপ্যো—ইল এ মিদি।" দেবী পুনরায় হলেন ঈভ্‌ এবং ঈভ্‌ হল সাধারণ নারী। ঢিলে গাউনের আস্তু করে সে একে একে পরল ব্রাজিয়ের, শ্লিপ প্যান্ট, ব্লাউজ, সাসপেণ্ডার, ষ্টকিং, স্কার্ট ও জুতো। প্রত্যেকটি পরিধেয় তার সম্পর্কিত অঙ্গ ও তার ক্রিয়ার ইশারা যেন ব্যাথা হতে লাগল তার গায়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। চিরুণী পড়ে চুল হল সুবিনাস্ত, গালে চড়ল রঙ, ঠোঁটে পড়ল কৃত্রিম রক্তিমা ও চোখে টেনে দিল সুর্মা। কে এল তার এক ছেলে বন্ধু। পরস্পরের বাহুতে বাহুবন্ধ করে তারা চলে গেল। যাবার আগে সবাই বলে গেল "অরভোয়ার, আদেম্যা"। [৪] দ্বার প্রান্তে অপেক্ষামান বা অপেক্ষামানা বন্ধু বা বান্ধবী যে যার সঙ্গী নিয়ে উধাও হল কাফেতে, নয় রোস্তরাঁয়। কারা বা গেল লুক্সাঁবুর্গ উদ্যানে এবং বেঞ্চে বসে খেতে লাগল স্যাণ্ডুইচ্‌। দুটোর পর থেকে ফের শুরু হবে কাজ, আসবে আর এক মডেল। সকালে যারা কাজ করেছে তাদের কেউ না কেউ হয়ত থাকবে কিন্তু আতলিয়ে চলবে সকালের মতই সেই একভাবে।

দারিদ্রেরও কৌলিন্য আছে। যে সবচেয়ে গরীব, তার স্থান স্যাণ্ডুইচ্‌-খাওয়া-শ্রেণীরও নীচে। সেখানে শুকনো রুটি আর তাকে গলাধঃকরণ ক'রতে যে রসনা রসের প্রয়োজন তার

৪। বিদায়, কাল দেখা হবে।

উপায়ের চেষ্টা করে মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো চীজে কামড় দিয়ে। এই ধরণের লাঞ্চ বা ডিনারের পরেও এক কাপ কফি খেতেও তাকে করতে হয় হিসেব, কারণ এও মাঝে মাঝে হ'য়ে যায় শৌখিন খরচ।

বাগানের এক নিভৃত কোণে বসে সে ভাবে, অতুল ঐশ্বর্যে শোনা যায় অনেকে থাকে অসুখী, সেইজন্যে এই অসীম গরিবানায় তার হওয়া উচিত পরম আনন্দ। আতলিয়েতে কেউ যদি আসে পরিচিত হতে, সে তখনি তাকে করে নিরস্ত। ভয় হয় যদি এই পরিচয়ের সঙ্গে হয় কাফেতে নিমন্ত্রণ। ভদ্রতার খাতিরে, সে নিমন্ত্রণের প্রতি নিমন্ত্রণ দেবার ক্ষমতা তার নেই। চায় না সে পরিচয়—চায় না সঙ্গী—বন্ধু বা বান্ধবী। একলা সে—স্বেচ্ছায়, নয় ঘটনাচক্রে। গ্যাগাঁ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণ ভাবে লোকের ধারণা যে, অন্তিম দারিদ্র দেয় শিল্পীকে মহাশিল্পের সন্ধান ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু তারা ক'জন জানে যে দারিদ্রের অন্তিম পারে পা দিলে মানুষের মস্তিষ্ক হ'য়ে যায় ঘোলা; আত্মাটাও ডুবে যায় অতল কালিমায়।

আতলিয়েতে সকলের পরিচিত আসল নামকে বিকৃত করে, ব্যঙ্গ নামকরণ করার একটা বাতিক ছিল অনেকের। একজন হোয়াইট্ রাশিয়ান ইহুদী, যার নাম ছিল পিটকীন্, সে ইংরেজী-বলা লোকেদের মহলে হয়ে গেল পিগ্‌স্কিন্। ইংরেজ মহিলা মাদাম মিউভিল, হ'লেন 'মাদাম্ মুভেদ্'। যাদের নাম উচ্চারণে জিভের আড় ভাঙতে কষ্ট হ'ত, তারা তাদের দেশের নামেই খ্যাত হল। আমাদের ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ্ পোলাণ্ডের লোক বলে অভিহিত হ'ল 'পোলনে' এবং সুইডিস ভাগারম্যান হয়ে গেল ম'সিয়ে সুইদোয়া। আমি পেলাম শ্বেতাবী নাম বুসা-সিলাসিউ —নির্বাক-বুদ্ধ। আমি ছাড়া আতলিয়েতে ছিল আরো একজন নির্বাক, যে চাইত না কারোর পরিচয় বা বন্ধুত্ব। আড়ালে সকলে তাকে বলতো মুখ-বোজা-মার্থ।

২

আতলিয়েতে প্রায় সব ছেলেরা চেষ্টা করেছে, মার্থের সঙ্গে মাখামাখির কিন্তু তার তর্জন ও তাচ্ছিল্যে হার মেনে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে যে সত্যি কেউ ভালবাসতে চেয়েছে, তা নয়। তাদের সকলের প্রয়াস ছিল তাকে জয় করবার। তারা তার পিছু নিয়ে দেখেছে, তার কোন ছেলে বন্ধু আছে কি না। সে লেস্‌বিয়ান্ কি না, তাও আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। কারণ তাদের ধারণায়, মেয়েরা যদি ছেলেদের সাথে প্রেম না করে, তাহলে তাদের প্রণয় হবে মেয়েদের সঙ্গে। এদুয়ের একটি হওয়া চাই। কিন্তু যখন তারা জানল যে মার্থ তাদের জানা কোন শ্রেণীতেই পড়ছে না তখন তাদের চেষ্টা চলল জানবার, মার্থ মেয়ে হিসাবে শারীরিক পরিপূর্ণ কি না। তাদের কৌতূহলী মন সব ভাবে তলিয়ে মার্থকে জানবার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে এখন হয়েছে নিরুৎসুক ও নিস্পৃহ।

মনে পড়ে ছোটবেলায় পুকুর ধারে দেখতাম জীবন্ত শামুক শুঁড় বার করে চলেছে। দিতুম একটা কাটির ঘা অমনি শুঁড়-বার-করা-মুখ উধাও হয়ে গেল, নিমেষে শামুকটা হল অজীব ও অচল। পা দিয়ে ঠেলা দিলাম, গেল সেটা গড়িয়ে। প্রাণের আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিস্তব্ধে লক্ষ্য করলাম, আবার বেরিয়ে এল শামুক থেকে খয়ের রঙের একটা জিভ, যার ডগায় রয়েছে উঁচিয়ে দু'টো শিং। আবার ধীরে মাটির গায়ে লেপ্‌টে চলল সে।

মার্থকে দেখে আমার মনে হত, সে যেন সেই শামুকের মতো হঠাৎ ঘা খেয়ে একটা খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। তাকে নাড়া দিলে আরও খোলের গভীরে নিজেকে সে তলিয়ে দেয়। আমার পাশেই ছিল তার মডেলিং ষ্ট্যাণ্ড। একবার তাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই আর সকলেই আমায় দিল তাড়া—"ওর সঙ্গে কথা ব'লো না হে, কামড়ে দেবে। খ্যাপা কুকুর দেখেছ? ও তার চেয়েও বেশী খ্যাপা। কাজেই ওর ধার সামলে চ'লো।" মার্থ এই কটূক্তিতে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। তার চোখের ঘোর নীল তারা দুটি একবার যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার সে দুটি পাথরের নকল চোখের মত নিরেট ও স্থির হয়ে গেল। সে ক'রে চলল আপন কাজ।

ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ্-এর আর্থিক সঙ্গতি ছিল প্রায় আমার, পিটকীন ভাগারম্যানের মত কিন্তু উদারতায় সে ছিল সবচেয়ে ধনী। সে থাকত গত শতাব্দীর কোন ধনীর পাঁচমহালী বাড়ীর প্রাঙ্গণ প্রান্তে জুড়িগাড়ীর আস্তাবলের একটি কামরায়, যেখানে থাকত আগে ঘোড়ার ঘাস। সে পাঁচমহালী বাড়ী এখন হোটেলে পরিণত আর আস্তাবলের প্রায় সবটাই ধোপার কাপড়-কাচাই-খানা। সেই আধ-অন্ধকার স্যাঁতসেতে, সিদ্ধকাপড়ের ও সাবানজলের ভ্যাপ্‌সা গন্ধে ভরা ঘর-খানিই ছিল সিত্রিনোভিচের বসবার দালান, শয়ন কক্ষ ও কাজের ষ্টুডিয়ো এবং সেইখানেই ব'সে ছুটির দিনে চলতো আমাদের চারজনের শিল্পালাপ ও খোসগল্প। পোলাণ্ডের ইহুদী সিত্রি-নোভিচ্ ছিল বেঁটে খাট মানুষটি, যার ছোট চোখ দুটোয় সর্বদা দেখা যেত যেন সদ্যঘুমভাঙা আঁখির জলভরা চাউনী। তার প্রায় টাকপড়া মাথার পিছনে ছিল শোণের মত জৌলুষহীন এক ঝুঁটি চুল, যা কয়েক বছর আগে হয়ত ছিল লাল্‌চে রঙের।

প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন থাকে কিছুটা অসাধারণের সম্ভাবনা যা যোগা-যোগে হঠাৎ উছ্‌লে বেরিয়ে আসে, আবার পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রে তার অভিব্যক্তি অঙ্কুরেই লুপ্ত হ'য়ে যায়। সিত্রিনোভিচের ভাস্কর্যে অসাধারণ ক্ষমতার ব্যঞ্জনা ছিল। কিন্তু কোথায় যেন ধাক্কা খেয়ে তার ভাস্কর্যের উচ্চ শির অযথা মাথা নামিয়ে জানাতে চাইত না তার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও মহত্ত্বের পরিমাপ। সে ছিল উৎকট কম্যুনিষ্ট্। ভাগারম্যান তাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো "তোমার কম্যুনিষ্ট হওয়া অত্যন্ত অশোভন, কারণ তাদের উন্নতা অন্ধ-বিশ্বাস ও হিংস্রকঠিন স্বভাব তোমার মধ্যে একটুও নেই।" সে একটুও না রেগে বলতো "ওটা রিত্রিক্‌শ্যানারিদের কম্যুনিষ্ট্ সম্বন্ধে একটি মিথ্যা ধারণা। বন্ধু আমরা উগ্র নই, কেবল আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতা তোমাদের চোখে লাগায় ধাঁধা, আমাদের একনিষ্ঠতা জাগায় তোমাদের মনে ও হৃদয়ে আশংকা। একবার আমাদের নীতি নিয়ে দেখ না, তোমার শতাব্দীর জমা পচনশীল ও প্রস্তরীভূত অচল ধারণা একটু তাজা ও সুক্ষ্ম হ'য়ে উঠবে।" একদিন সে তর্কে আমাকে বলেছিল "আরে এই যে পাথর কেটে মূর্তি গড়া সেটা কি কেবল ধ্বংস? এ কেবল অপ্রয়োজনীয়কে বাতিল করে আসল বক্তব্যকে সকলের সামনে পরিস্ফুট করবার একটি অবশ্য উপায় মাত্র। অনেকদিনের অবহেলিত ও নিবন্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রে ধরে যায় মরচে, তাকে একটু ঘসে মেজে না নিলে ক্ষয় অগ্রসর হ'তে থাকে তার প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে।" আমরা যখন হেসে তাকে খেপাবার ছলে বলতাম "বকে যাও গো কার্লমার্ক্‌সের তোতাপাখী, ষ্টালিনের পাঁচালী গাও তো তোমাকে দেব আরও দানা।" সেও তেমনি হেসে বলত "ডেকাডেন্সের ডেলা সব তোমাদের প্রগ্রেসিভ্ রোলারের চাপে দেব গুঁড়ো করে।" তারপরই

হাত ধরে টান্‌ত ক্যাফে দোমেতে যাবার জন্যে এবং তার শেষ কপর্দক খরচ করে আমাদের এক পেয়ালা কফি খাওয়াতো। মাঝে মাঝে চলত আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সম্বলের বিনিময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার অক্ষম চেষ্টা। সিত্রিনোভিচের জুতো জোড়া মেরামত হ'তে হ'তে শেষে তালির তালিতে আর যোগাযোগ রাখবার স্থান ছিল না। ফাটা চামড়ার পর্দা উঁচিয়ে প্রায়ই উঁকি মারত তার পায়ের বুড়ো আঙুল আর গোড়ালির কড়া। ভাগারম্যান একদিন, পুরোন হলেও সেলাই খোলেনি এমন একজোড়া জুতো এনে তাকে উপহার দিল। বল্‌ল যে তার এক বন্ধু ভুলে তার হোটেলে জুতো জোড়া ফেলে গিয়েছে এবং তাকে লিখে জানিয়েছে যে তার ওটার আর প্রয়োজন নেই, তাই সে দিয়েছে সিত্রিনোভিচ্‌কে। আমরা সবাই মেনে নিলাম তার কাহিনী, কেবল জানতাম যে জুতো জোড়া ওর নিজেরই।

আতলিয়েতে একদিন সিত্রিনোভিচ্‌ এল অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে। সুসংবাদ যে তার ভাগ্যে একটি ভাস্কর্য রচনার কমিশন মিলেছে। সে আমাদের তিনজনকে বল্‌লে যে আমরা তাকে এ কাজে সাহায্য না ক'রলে সে প্রতিশ্রুত সময়ে মূর্তিটি শেষ করতে পারবে না, অতএব আমাদের তার সঙ্গে হাত লাগান চাই। ভাবলাম বুঝি কোন এক বিরাট মূর্তি তৈরী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল আড়াই ফুট উঁচু একটি বছর দশেক মেয়ের প্রতিমা, যা সিত্রিনোভিচ্‌ নির্দিষ্ট সময়ে একাই অনায়াসে শেষ করতে পারত। আমাদের তাকে সাহায্য করা ভান মাত্র দেখাল কারণ আসলে সে একাই করল সবকিছু। কয়েকদিন পরে সে এল আতলিয়েতে হাতে একতাড়া একশো ফ্রাংকের নোট নিয়ে—ভাবটা যেন ন্যাশন্যাল লটারী জিতেছে। নোটগুলিকে ব্যাংকের কোষাধ্যক্ষের মত পারদর্শিতা দেখিয়ে গুণে, সে করল চারটি সমান ভাগ এবং আমাদের তিনজনের হাতে গুজে দিল তারই এক একটি। বল্‌ল, তাকে সাহায্য করার পারিশ্রমিক। সিত্রিনোভিচ্‌কে আমরা চিন্‌তাম ভাল করেই। এ অর্থ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ হ'ত না। সে পেয়েছিল তো মোটে পাঁচশো টাকার মত ফ্রাংক, তার আবার ভাগাভাগি! কিন্তু কে তাকে বোঝাবে একথা। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম ঐ ওর পথ্যতেই দেব তাকে ফিরিয়ে, তার কষ্ট-লব্ধ পারিশ্রমিক। পিট্‌কিন ভান করল একটি মূর্তি নির্মাণের কমিশন পেয়েছে এবং সে আমাদের ডাকল তাকে সাহায্য করতে। যখন তার মনগড়া একটি মূর্তি আমরা হাত লাগিয়ে শেষ করলাম, সিত্রিনোভিচ্‌কে আমাদের তিনজনকে দেওয়া ফ্রাংকগুলি তার পারিশ্রমিক বলে পিট্‌কিন্‌ তার হাতে দিল। সজলচোখে সিত্রিনোভিচ্‌ বল্‌ল, "তোমরা আমার অপমান করছ। চালাকি করে তোমাদের পারিশ্রমিক আমাকে ফেরৎ দিচ্ছ আর মনে কর—আমি এতই মূর্খ, যে এটা বুঝতে পারব না। আমি গরীব, সহানুভূতি দেখিও কিন্তু দয়া দেখাবার চেষ্টা ক'রো না।" ভাগারম্যান তার বিরাট দুই হাত সিত্রিনোভিচের প্রায়-দুমড়ে-পড়া-কাঁধের উপর সস্নেহে রেখে বল্‌লে "বন্ধু, তুমি টাকাটাকে এত প্রাধান্য কেন দিচ্ছ? কয়েকটা ফ্রাংককে উপলক্ষ করে তুমি আমাদের জানিয়েছিলে তোমার অপরিসীম বন্ধুপ্রীতি, দিয়েছিলে আমাদের তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা উজাড় করে। আজ যদি আমরা সে দানকে কত আদরে গ্রহণ করেছি তার একটা ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি দেখাবার চেষ্টা করি, নির্দয় না হলে তুমি তা প্রকাশ করতে বাধা দেবে না।" ভাগারম্যানের বলবার ধরণে ছিল যেন এক কলাকুশলী সেক্‌স্‌পীয়েরিয়ান্‌ অভিনেতার সম্মোহনের ভংগিমা। সে বাধ্য করল অভিভূত সিত্রিনোভিচ্‌কে ফ্রাংকগুলি নিতে। সে নোট্‌গুলি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বল্‌ল "চল শয়তানের

দল আমার সঙ্গে এখুনি কাফে দোমে। এই ছল পারিশ্রমিকের কিছুটা খরচ করে আমার সঙ্গে একপাত্র মদিরা পান করলে তোমাদের বন্ধুপ্রীতি আশা করি শুকনো হ'য়ে উঠবে না।

এরপর চলে গেল কয়েকটা বছর ধ্বংস ও মৃত্যুর লীলাতাণ্ডবে ভরা স্থিতীয় মহাযুদ্ধে। পারী ছাড়ার আগে আমার সামান্য সংগ্রহ ও সম্বলের পুঁজি রেখে এলাম সিত্রিনোভিচের আতলিয়েতে। বিদায় নেবার সময় সে বল্‌ল "জান আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে যে, প্রত্যেক বন্ধুকে বিদায় কালে আমরা দিয়ে দিই একখানা করে বুকের হাড়।" বল্‌লাম "বন্ধু আমি যেখানেই যাই না কেন, তোমার ঐ হাড়খানা অনুসরণ ক'রে সর্বদা পোঁছবে তোমার সবটাই আমার মনে।"

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রলয়বিধ্বস্ত ইয়োরোপের ঘটনা পুরোন কথায় দাঁড়িয়েছে। ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তন ক'রে ভয়সংকুল মনে খুঁজে বেড়িয়েছি হারান বন্ধুত্বের স্রোতগুলি। কিন্তু সেগুলি কতক গেছে লুপ্ত হয়ে যুদ্ধাগ্নির শিখায় এবং কতকগুলি হারিয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত, অজানা, সংখ্যাহীন বিতাড়িতের গন্ডালিকায়। গেলাম সিত্রিনোভিচের আতলিয়ের ঠিকানায় কিন্তু পোঁছে দেখি সেখানে সে বাড়ীর কোন চিহ্নই নেই। পড়ে আছে একফালি ফাঁকা জমি, যার বুকের উপর কয়েকটা পুড়ে যাওয়া ভাঙা ইটের গাঁথুনি জানাচ্ছে এককালে সেইখানে হয়ত ছিল ঘর। হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় সামনের হোটেলের দরজা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল এক বৃদ্ধা কাঁশিয়ার্জ। কাছে গেলে বল্‌ল। 'কি খুঁজছ ওখানে?' জিজ্ঞাসা করলাম সিত্রিনোভিচ্‌ ও তার ঘরের খবর। বৃদ্ধা জানাল যে সিত্রিনোভিচ্‌ আর নেই এ জগতে। হাঁন বস্‌রা তাকে হত্যা করেছে। এই পাড়ায় একটি জার্মাণ সৈন্যের কে গুপ্তভাবে প্রাণ নেয়, তার প্রতিশোধ নিতে নাৎসী শাসক গ্রেপ্তার করে একশো নিরপরাধী অসহায় নাগরিকদের। তার মধ্যে ছিল বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে। সিত্রিনোভিচ্‌ ছিল তাদের একজন। তারা সকলেই হারিয়েছিল প্রাণ, কেবল সিত্রিনোভিচের মৃত্যু হয়েছিল একটু স্বতন্ত্রভাবে। বন্দীদের মধ্যে একটি যুবতীকে এক জার্মাণ সৈনা ধর্ষণ শুরু করায় সিত্রিনোভিচ্‌ যায় এগিয়ে, তাকে রুখতে। কিন্তু সে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি, সেই সৈন্যের আগ্নেয় অস্ত্রে মুহূর্তের মধ্যে শত শত গুলিতে তার দেহখানা করে দিয়েছিল ঝাঁঝরা। শুধু তাই নয়, গেস্টাপেরা এসে ভাঙল তার আতলিয়ে আর সেই ভগ্নস্তূপে লাগিয়ে দিলে আগুন, তার অস্তিত্বকে ধরার বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে। ভাগারম্যান ও পিট্‌কীন আজ কোথায় তা জানি না। সিত্রিনোভিচের সংক্ষিপ্ত জীবনী ক'জনেই বা জানে, বা জানবার তাদের প্রয়োজন কি! আমার কাছে র'য়ে গেছে তার স্মৃতির একটা ছাপ, যা মুছে দিতে চাইলেও যাবে না মুছে। আজও যেন শুনতে পাই তার স্বর, দেখ্‌তেও পাই যেন তার স্বরূপটা—একটি সাধারণ মানুষ, যাকে আরও দশজনে জানবার সুযোগ পেলে সে হ'তো অসাধারণ।

সিত্রিনোভিচ্‌কে কে বল্‌বে না বীর? নিজের সামনে অসহায়া একটি যুবতীর পাশব ধর্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখা তার পৌরুষে সহ্য হয়নি বলেই জেনে শুনেই সে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদের তীব্রতায় মৃত্যুকেও সে মনে করেছিল তুচ্ছ। এই পুরুষকার হয়তো সাময়িক কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলের মধ্যে থেকেই এটা ফুটে বেরোয় না। তার কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় আর এক কাহিনী।

দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন পুরোদমে চলেছে। দলে দলে শিক্ষিত যুবক স্বার্থত্যাগ ক'রে খদ্দরের সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে নেমেছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠায়। তাদের অনেকেই দু' একবার কারাবাস ক'রে ফিরে এসেছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন হরিপদদা। তাঁকে কোন্ কারণে মাষ্টার মশাই বা পদবী দিয়ে অভিহিত না ক'রে কেন যে হরিপদদা বলা হত তা জানি না।

তিনি ছিলেন আমাদের দাদা স্থানীয় বন্ধুদের শিক্ষক। একহারা কাঁচা সোনার রঙের চেহারা ছিল তাঁর। কদম ছাঁটাই কালো চুল আর কালো এক জোড়া ভুরু ও কালো জ্বল্‌জ্বলে চোখের বাহার মিলিয়ে তাঁকে সুপুরুষ বলা গেলেও, বীরোচিত কিছু ছিল না তাঁর চেহারায়। বরং ক্ষীণ বপু সামর্থহীনদের দলে তাঁকে পংক্তিভুক্ত করলে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তাঁর মুখে সর্বদাই হাসি লেগে থাকত কিন্তু মাঝে মাঝে সে হাসির পিছনে উঁকি ঝুঁকি মারত দারুণ রাগের ছায়া, যা কোন সময়ে ফেটে বেরুলেই ঝাঁঝিয়ে দিত রুদ্র তান্ডবের ডঙ্কা। হরিপদদা আমাদের ছোটদের সঙ্গে কানামাছি খেলতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং আমাদের উপর কোনদিনই তাঁর রাগের উত্তাপ এসে পৌঁছয়নি। সেটা বরাদ্দ ছিল কেবল প্রাপ্ত বয়সীদের জন্যে।

একবার তিনি দুটি ছাত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন জু-গার্ডেনে। গার্ডেন থেকে তিনি স-ছাত্র শেয়ালদা ষ্টেশনে চলেছেন বালিগঞ্জের গাড়ী ধরতে। দু'একদিন আগে বর্ষা আসব জানিয়ে দু'এক পশ্‌লা বৃষ্টি ফেলে গেছে। পথে সস্তায় সওদা করেছেন একজোড়া মরশুমী ইলিশ মাছ। ষ্টেশনে তিনি উপস্থিত হলেন এক হাতে ছাতি অপর হাতে মৎস্যদ্বয়, আর তাঁর ঝোলা খদ্দরের পাঞ্জাবীর দুই খেই ধরে তাঁর নাবালক সঙ্গী দুটি। টিকিট চেকারদের অন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল দুটি গোরা পল্‌টন্। তাদের কোমরে রিভলবার, হাতে ছোট ছড়ি। গেট পেরিয়ে যেমন বাড়ী মুখো কেরাণীকুল প্লাট্‌ফর্মে ঢুক্‌ছে, অমনি তারা তাদের পিঠে সপাং করে এক ঘা বেত লাগিয়ে খিল্ খিল্ হাসছিল। যেন কত মজার ব্যাপার। হরিপদদা একবার ভাল করে এদিক ওদিক তাকিয়ে ছাত্রদের বল্‌লেন, 'তোরা ঠিক আমার পিছনে থাকিস্—বলে বুকটাকে যতদূর সম্ভব সামনে চিতিয়ে তিনি গেট্ পেরুতে সুরু করলেন। সপাং করে পড়ল চাবুক তাঁর পিঠে। যেমন সহস্র আরও লোকের উপর তা পড়েছিল। কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁর বাঁ হাতের ইলিশ জোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে বাঁ দিকের গোরার মুখমন্ডলে আছাড় খেতে লাগল আর সেই তালে তাঁর ডান হাতের ছাতির শেষাগ্র ডানদিকের পল্‌টন্ সাহেবের উদরে বিশেষ উত্তেজনা সহকারে নৃত্য সুরু করল। হরিপদদা সে সব্যসাচীর মত এক সঙ্গে এমন দু'হাত চালাতে পারেন, এ দেখ্‌লে তাঁর পরিচিত অনেকেই হতভম্ব হয়ে যেত। ছাত্ররা তো ভয়ে আড়ষ্ট। এই বোধহয় হরিপদদার শেষ আস্ফালন। পল্‌টন্‌রা এখুনি রিভলবার বের করে তাঁকে গুলি করে, দেবে দফারফা করে। কিন্তু এই ভাবনা তাদের মাথায় ভালভাবে কায়েমি হবার আগেই যে নিঃসহায়ক কাপুরুষ কেরাণীকুল বেত খেয়ে নীরবে চ'লে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন কার মায়া আহ্বানে জেগে উঠে মার্ মার্ শব্দে পল্‌টন্ দু'টিকে ঘিরে ফেল্‌লে। কেউ তাদের হাতদুটি ধরলো মুচড়ে পিছনে। একটু আগে এরা বীরত্বের দম্ভে হেসে মারছিল বেত, এখন ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গলার সুর মিহি করে চ্যাঁচাতে লাগল 'হেল্‌প হেল্‌প'। রেলওয়ে পুলিশ কয়েকজন সত্বর এসে পড়ায় তারা কোনমতে উদ্ধার পেল মারমুখী জনতার পীড়ন থেকে। হরিপদদা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ছোট সঙ্গী দুটির সঙ্গে। তিনি পুলিশদের বল্‌লেন 'ও দুটোকেও গ্রেপ্তার কর, ওরাই প্রথম মেরেছে।

ইতস্ততঃ ক'রে পুলিশরা খুব অমায়িকভাবে পল্‌টন্ দু'জনকে তাদের সঙ্গে যেতে বল্‌ল। তারা বাধ্য শিশুর মত চল্‌লো তাদের নির্দেশ অনুযায়ী। ষ্টেশনেই একটি ছোট কোর্টের মত আদালত বসলো। যিনি জজিয়তি করছিলেন তিনি খুব আম্‌তা আম্‌তা ক'রে টমি দুটিকে বল্‌লেন যে বাবুটির এই অভদ্র আচরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, তার মারফৎ এই আদালতের সবাই তোমাদের এবং সরকারের মাপ প্রার্থনা করছি। এইবার হরিপদদার রাগের বম্ ফেটে পড়ল। তিনি যে জজিয়তি করছিল তার দিকে না তাকিয়েই বলতে আরম্ভ করলেন, টমি দুটিকে উদ্দেশ্য ক'রে "বীরের সন্তানদের কি উচিত আচরণ, নিরস্ত্র জনতা যারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের বেত মেরে বেইজ্জৎ করা? কোমরে রিভলবার আর পল্‌টনের ইউনিফর্‌ম প'রে বড় দম্ভ তোমাদের —মনে করছ নিজেদের শাসক আর আমরা তোমাদের গোলাম। আমি লিখব তোমাদের কমানড্যান্ট-এর কাছে, তোমাদের এই নিলর্জ তামাশার কথা আর তাতে সই থাকবে এই জনতার প্রত্যেকটি লোকের।" জজ্ সাহেব তখন বলছেন "মশাই চুপ করুন, এরকম বেয়াদপি করলে জেলে যাবেন।" তাকে ধমক দিয়ে তিনি বল্‌লেন "চুপ কর্ মোসাহেব—ইংরাজের কেনা দাস। নিজের মান সম্ভ্রম ওদের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছ এখন চাও আমরাও তোমার মত ওদের নিষ্ঠিবন ভক্ষণ করি।" ইতিমধ্যে পল্‌টন্ দুটি এগিয়ে হরিপদদার দুটি হাত ধ'রে বলতে শুরু করেছে "বাবু আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা তোমার এবং সকলের কাছে মাপ চাচ্ছি আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা এরকম অভদ্র আচরণ আর কোনদিন করব না।" জনতা তাদের এত নরম হতে দেখে চ্যাঁচাতে লাগল "মার্ বেটাদের, খুন কর" ইত্যাদি। কিন্তু হরিপদদা হঠাৎ শান্ত হয়ে বল্‌লেন "ছেড়ে দাও ওদের, আমরা ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি কিন্তু আমরা ভদ্র জাত। কুকুরে কামড়ালে তাকে কামড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আশা করি এই শিক্ষা যেন ওরা মনে রাখে। তারপর জজ্ আর পুলিশের হুকুমের অপেক্ষা না করেই তিনি ছাত্র দুটিকে বল্‌লেন "চল্ এখন বাড়ি। কিছুটা যুদ্ধাহত অবস্থায় মাছদুটি তখনও তাঁর হাতে। সদর্পে ছাতি বগলে বুক চিতিয়ে চলেছেন একটি ক্ষুদ্রবপু বাঙালী, যার মনে প্রাণে জীবনীশক্তি টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে।

জানি না আজ হরিপদদাই বা কোথায় আর কোথায়ই বা সেই পরাধীন ভারতের শাসক পল্‌টন্ দুটি। তিনি হয়ত এই ঘটনাকে ভুলে গেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রম কারাবাসে ও জীবনের বৃহত্তর কর্মে। পল্‌টন্ দুটি যদি এত লড়াইয়ের ধুমধাক্‌কা কাটিয়ে বেঁচে থাকে আজও, হয়ত মনে করে তাদের রিভলবারের সামনে চিতিয়ে দেওয়া শীর্ণ একটি বক্ষ, যার মধ্যে সাহস ও বীরত্বের অভাব ছিল না।

আত্মজীবনী

সোমেন বসু

আত্মকথা বা আত্মজীবনী সম্পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য কিনা এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বর্তমানে সুরু হয়েছে। এতদিন এইবস্তু নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামান নি। কারণ বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ভাল ভাল আত্মজীবনী সৃষ্টি হলেও তা বেশীদিনের পুরোনো নয়। তাছাড়া অনেকের মনেই একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে যে আত্মকথা আত্মপ্রচারের মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয়। ব্যক্তিবিশেষের কথায় নিশ্চয়ই একটা আত্মবোধ প্রবল হবে—সুতরাং ওটাকে সাহিত্য বলে মনে করতে ঔৎসুক্য ছিল না অনেকেরই। জীবনী সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা—ভাল ভাল জীবনী যে বাংলাভাষায় লেখা হয়নি তা নয় কিন্তু তাকে সাহিত্য বলে মনে করেন ক'জন? ঘটনা সন্ধানের প্রয়োজনে মোটা মোটা জীবনীর পাতা উল্টে তাকে প্রায় একটি 'রেফারেন্স বুকে'র সমপর্যায়ে ফেলে দিই আমরা।

আত্মজীবনীর সঠিক সীমানা আমাদের জানা নেই বলে অনেক সময় পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ভুল করে বসেন। নানাজাতের অতীত স্মৃতির রোমন্থন, ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষের স্মরণ-কথাকে আত্মফলে আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্যটুকু সঠিক ধরতে না পেরে অন্যান্য জাতের রচনার সঙ্গে অনেকেই তাকে মিলিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়েছেন। ইংরাজীতে Diary, Memoirs, প্রভৃতি নানা নামের রচনা চলে আসছে বহুকাল ধরে। ইউরোপবাসীর ডায়েরী লেখার ঝোঁক আমাদের চেয়ে প্রচুর পরিমাণে বেশী; কোন অভিযান, কোন যুদ্ধ, কোন নতুন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলেই memoirs, বা reminicense-এর ছড়াছড়ি পড়ে যায়। সেই জাতীয় লেখা বাংলাতেও কিছু কিছু হয়েছে। বহুলোকের ডায়েরী, বহু লোকের স্মরণে-লেখা রচনা, বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ, জেল-জীবনের স্মৃতিকথা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেই জাতীয় রচনাগুলিকে আত্মজীবনী বা আত্মকথা মনে করে সবিস্তৃত আলোচনা করছেন কেউ কেউ। তার ফলে আত্মজীবনীর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা ক্রমশই অবহেলিত হচ্ছে এবং জটিলতর হচ্ছে।

নিজের মনের কথা যে কোন ভাবেই বলবার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু নিজের কথা বললেই যে তা আত্মকথা হবে না তা বলাই বাহুল্য। তা যদি হতো তাহলে নিজের কোন একটি সুখদুঃখের প্রকাশক কোন একটি ছোট গীতিকবিতাকেও আত্মকথা বলতে হতো। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—এই কবিতায় কবির মনের একটি গভীর সত্যের রসসিক্ত প্রকাশ আমরা দেখেছি। এই ধরণের হাজার হাজার আত্মউদ্ঘাটনের প্রয়াস পৃথিবীর সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। অথচ এগুলি একান্তভাবে কবির মনের কথা হলেও তারা আত্মকথা নয়।

নিজের জীবন কথা বলার চেষ্টাতেই আত্মজীবনীর সৃষ্টি। সেটার মধ্যে একটা পূর্ণতার আভাস থাকা চাই। জীবনের যে কোন দুচারটি ঘটনা তুলে দিলুম, ছোট ছোট চমকপ্রদ গল্পের মতো পাঠকের মন তাতেই খুসী হতে পারে কিন্তু সে রচনা আত্মজীবনী নয়। নিজের জীবন-কাহিনী বলা এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের মানসবিবর্তনের ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলার নামই আত্ম-

জীবনী। সব আত্মজীবনীতেই যে এই দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা নয়। কোথাও হয়তো জীবন বৃত্তান্তের বৃত্তান্ত অংশটা প্রবল হয়ে ওঠে, কোথাও জীবন-ফল্গুর অন্তর্নিহিত বোধের প্রবাহটিকে প্রকাশ করার চেষ্টাই প্রধান হয়। এই দুই সুরের প্রাধান্য অনুযায়ী আত্মজীবনী কখনো মূলতঃ ঘটনাবাহী হয়ে ওঠে কখনও বা দার্শনিকতার সুনিশ্চিত স্পর্শ এসে লাগে। নিজের মনোভাব প্রকাশকেই সাহিত্যের প্রেরণা বলে আমরা মেনে নিয়েছি। তার উদ্দেশ্য, তার ভঙ্গী এবং তার গাম্ভীর্যের উপরেই সৃষ্টির গুরুত্ব নির্ভর করে। একথা সবাই জানেন যে আটপৌরে কথায় না বলে যেখানে কিছু কৌশল এবং আভাষে কথা বলি সেখানেই সেই বলা চিরাচরিত প্রকাশভঙ্গীর থেকে কিছু পার্থক্য, বৈচিত্র্য দাবী করে। সুতরাং অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মতো আত্মজীবনীরও একটা ভঙ্গীগত বিশিষ্টতা আছে। সেটাকে মানতে হবে। আত্মজীবনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় সব লেখকই সচেতন—সেই উদ্দেশ্য তার সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ের যথেষ্ট সাহায্য করে। আত্মপ্রচার যেখানে প্রবল, আত্মউপলব্ধির চিহ্ন যেখানে দুর্বল সেখানেই সেই গ্রন্থের রসজীর্ণতা সপ্রমাণ। তাছাড়া রচনার ভাব ও প্রকাশের সম্মিলিত গাম্ভীর্যের প্রশ্নও অল্প নয়। বেনভেনুটো চেলিনির 'আত্মজীবনী' য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সেন্ট অগষ্টিনের রচনার পর এই গ্রন্থই প্রাচীনত্বের মূল্য দাবী করে। চেলিনির প্রকাশভঙ্গী সবল, ভাবও অল্প নয়—কিন্তু দুয়ে মিলে গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব। তৎকালীন য়ুরোপের অনাত্ম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জীবন গোয়েন্দা-উপন্যাসের নায়কের মত নানা বিচিত্র দুঃসাহসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ-জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেও পাঠকের মনে কোন সাড়া তুলতে পারেন নি তিনি। কেবলমাত্র যথোচিত মাত্রাবোধের অভাবে চেলিনির-আত্মকথা সার্থক হলো না।

আত্মজীবনী ভাল সাহিত্য হতে হলে যে জিনিষটি বিশেষ প্রয়োজন তা হলো এই যে, লেখকের জীবনের কোন না কোন তাৎপর্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠা চাই। গতিশীল জীবনের গতির ধারাটিকে ভিতরের সাক্ষ্যসমেত ফুটিয়ে তোলার কাজই হলো আত্মজীবনীর কাজ। সে বই পড়ার পরে একটি সম্পূর্ণতার ভাব মনে আসা চাই। যেখানে সেটি নেই সেখানে সাহিত্য হিসাবে সে আত্মজীবনী গণ্য হবে কিনা এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' এই দিক থেকে কখনই ভাল আত্মজীবনীর মর্যাদা পেতে পারে না। সেখানে টুকরো টুকরো ঘটনার সমষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ তাঁর গ্রন্থের অনেকটা জায়গা জুড়েছে। সুতরাং জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি গড়ে তোলাই আত্মজীবনীর কাছ থেকে আমাদের স্বল্পতম দাবী। সেই স্বল্পতম দাবীটুকু মেটার পর বিচার করা যেতে পারে যে তা সৎ-সাহিত্য হলো কিনা। বহু স্মৃতিকথা আছে যেখানে লেখক বা লেখিকা তাঁদের জীবনের বিশেষ বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ করে কিছু লিখেছেন—যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যাঁদের দেখেছি', অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে', প্রতিমা ঠাকুরের "নির্বাণ", মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"। এগুলিকে কোনমতেই কোন দূরতম কল্পনাতেও 'আত্মজীবনী' বলা চলবে না। লেখক বা লেখিকা এখানে অন্য ব্যক্তি বা ঘটনার সাক্ষ্যবহন করছেন মাত্র। তাঁর নিজের জীবনের ঐটুকু ছাড়া আর কোন কথা এর মধ্যে নেই। সুতরাং আত্মবিলীন স্মৃতি-রোমন্থন কখনোই আত্মজীবনীর সমার্থক নয় একথা বুঝতে হবে। লেখকের নিজেকে নিয়েই আত্মজীবনী—সেখানে অকারণ বিনয়ের অবকাশ কম।

আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক কর্মীরা জেলখানার দিনগুলিকে নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোন আধুনিক সমালোচক আত্মজীবনীর আলোচনার মধ্যে সেগুলিকে পাংক্তেয় করে দিয়েছেন। আত্মজীবনীর স্বরূপ ভুলে, তার অত্যুৎসাহী ভক্ত হয়ে নানাধরণের রচনাকে তার গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে নিয়ে, আলোচ্য বস্তুর গৌরব বাড়ানোর চেষ্টা নিছকই ছেলে-মানুষী। এই রচনাগুলির মধ্যে সেই পূর্ণতার অভাব যার মধ্যে দিয়ে একটি জীবনধারার বিবর্তন বা স্রোতের একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। খাপছাড়া একটা অংশ যতই কৌতুকপ্রদ হোক, বাচনভঙ্গী যতই ভাল হোক, তা আত্মজীবনীর মর্যাদা লাভ করবেনা।

আগেই বলেছি আত্মজীবনী একটি জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হওয়া চাই। এবং জীবনের সেই পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি একটি গতির পটভূমিকায় না হলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনার সূত্র যোজনা করে জীবনের আভ্যন্তরীণ ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধতা করে থাকি আমরা। ডায়েরীর সঙ্গে আত্মজীবনীর একটা মূলগত পার্থক্য আছে। ডায়েরীতে প্রতিদিনকার ঘটনা আমাদের জীবনের এক একটি দিনকে চিরকালের মত স্থির করে বেঁধে রাখে। তারা প্রত্যেকেই দিনে দিনে পূর্ণ, জীবনব্যাপী সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত তাদের মধ্যে অল্প। সাময়িক উত্তেজনায় একটি দিনের ঘটনা ডায়েরীর পাতায় বিরাট অংশ জুড়ে বসতে পারে—কিন্তু জীবনের সম্পূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তোলার মধ্যে তার স্থান হয়তো কিছু মাত্র না থাকতে পারে। যে ঘটনা আজ ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে সে ঘটনার প্রতি কিছুকাল পরেই ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষমাসুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট—"আমি যদি বোকামী করে প্রতিদিনের ডায়েরী লিখে যেতুম, তাহলে তাতে করে হোত আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তাহোলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিতো।" কতকগুলি ঘটনা জীবনরচনার সহায়ক হতে পারে না—কারণ ঘটনা মাত্রেই অচল, তা একবার ঘটে গেলে তার উপর নতুন করে রং চড়াবার সুযোগ নেই। সুতরাং এই অচল ঘটনাবলীর স্তূপ বেড়ে উঠে জীবনের প্রবহমানতায় বাধা সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং ডায়েরীজাতীয় রচনা কখনোই আত্মজীবনীর সমগোত্রীয় হতে পারে না। ইসাডোরা ডানকান তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন—

Incidents which seemed to me to last a life time have taken only a few pages; intervals that seemed thousand of years of suffering and pain and through which in sheer self-defence, in order to go on living, I emerged an entirely different person, do not appear at all long here."

কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা হলেই আত্মজীবনী সংসাহিত্য হবে এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। কারণ পূর্ণাঙ্গ জীবন যদি শুধু ঘটনাবাহী হয় তাহলে তার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পথ খোলাই রইলো। এ ত্রুটি শুধু আত্মজীবনীতেই ঘটতে পারে তা নয় যে কোন ধরণের ইতিবৃত্তমূলক রচনা এর কবলে পড়ে ব্যর্থ হতে পারে। কোন দেশের ইতিহাস, কোন ব্যক্তির জীবনী কখনও সত্য হয়ে উঠতে পারে না যদি লেখক সাংবাদিকের মত কেবল প্রতিদিনান্তের ঘটনাবলীর হিসাবই রেখে যেতে থাকেন। এ সম্পর্কেও ইসাডোরা ডানকান বলছেন—

No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of the most famous women are a series of accounts of the outward existence, of

petty details and anacdotes which gave no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent.

শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে এ কথা বল্লেও অধিকাংশ আত্মকথা, জীবনী, ইতিহাস সম্বন্ধে এ কথা খাটে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সংসারে কোন সাহিত্যই যেমন বাস্তব ঘটনার ফটোগ্রাফ নয় তেমনি আত্মজীবনী বা জীবনীও যা সত্যি সত্যি ঘটে তার যথাযথ অনুলেখন নয়। জীবনকেও সৃষ্টি করতে হয়—রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয়ের প্রথম প্রবন্ধে কোন্ কাব্যগ্রন্থ কবে প্রকাশ হলো তার তালিকা দেননি, যে বৃহত্তর সত্তা তাঁর অগোচরে তাঁর সুবিস্তৃত কাব্যসৃষ্টির জগতে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন তাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন।—অর্থাৎ তাঁর 'বড় আমি'কে উপলব্ধি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন করে। কোন স্রষ্টার জীবনের সচেতন গতিবিধির সঙ্গে তার স্রষ্টাসত্তার গভীর বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে—যেমন ইসাডোরা বলছেন—

"If I were a writer and had written of my life twenty novels or so, it would be nearer the truth. And then after I had written these novels. I should have to write the story of the artiste, which would be a story apart from all the others. For my artist life and thought of art have grown quite aloof and grow still like a seperate organism, seemigly quite independant of what I call my will."

টলষ্টয়ের জীবন সম্বন্ধে গোর্কী যে জীবনকাহিনী লিখেছিলেন তাতে নির্বিচারে টলষ্টয়ের জীবনটিকে লোকচক্ষে যেমন দেখাতো তেমনি করেই দেখাবার চেষ্টা ছিল। ঘটনাগত এবং চরিত্রের আপাতঃ বৈশিষ্ট্যগত সত্যতা হয়তো ছিল কিন্তু যে সত্যগুলিকে বাদ দিলে টলষ্টয়ের অসাধারণত্ব আরও প্রকাশ পেতো সেগুলিকে বাদ না দিয়ে ঘটনাগত বাস্তবিকতাকে বড় করে তুললেন গোর্কী এবং তার দ্বারা টলষ্টয়ের যথার্থ পরিচয় ক্ষুণ্ণ হলো। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত আলোচনা মনে রাখবার মতো—'ম্যাক্সিম গোর্কী' টলষ্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখর-বুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলষ্টয় দোষগুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয় টলষ্টয় যে সর্ব-সাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয় এমন কি অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলষ্টয়ের কিছুই মন্দ ছিলনা এ কথা বলাই চলেনা, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলষ্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের তাঁর ক্ষণিক-মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী।'

তাই আত্মজীবনীর স্বরূপের ধারণা স্পষ্ট না হলে, আত্মজীবনী যে নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করা একথা না বুঝলে স্মৃতিকথা, ডায়েরী, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতিকে আত্মজীবনী বলে কেবলই ভুল করতে থাকবো। সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের ইতিকথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় সঙ্গীতে 'রাগ' বস্তুটি ললিতকলার জগতে এক অপূর্ব অবদান। রাগকে আমরা বলি আন্তর-বাহ্যাবগাহী পদার্থ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষে থাকে বাইরের ইন্দ্রিয় ও মন। মানসপ্রত্যক্ষের অপর নাম সংবেদন বা অনুভূতি। সুতরাং মনের প্রত্যক্ষ বা অনুভূতিসিদ্ধ যে তরঙ্গায়িত বস্তুকে আমরা স্বরের মাধ্যম কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করি তাই 'রাগ'। রাগে থাকে শব্দতরঙ্গ, শ্রুতিমাধুর্য, লাবণ্য, ভাব ও রস। স্বরের বন্ধনে দেখি ও ব্যবহার করি এবং মন দিয়ে তার ভাব-রূপ অনুভব করি ব'লেই মনোবৈজ্ঞানিকের ভাষায় তাকে বলা হয় আন্তর-বাহ্যাবগাহী (psycho-physical) পদার্থ। রাগকে পদার্থ বলার কারণ ব্যবহারিক জগতে তাকে আমরা কাজে লাগাই ও তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আসল কথা এই যে, 'রাগ'-বস্তুটির রূপ ও ব্যঞ্জনা প্রথমে সৃষ্টি হয় মনে, মনের জগতেই তার প্রথম বিকাশ, তারপর স্বরের আভরণ দিয়ে প্রকাশ করি বাইরে।

ভারতীয় রাগের বিকাশে প্রাধানতঃ তিনটি স্তর আমরা স্বীকার করি ঃ প্রথমটি জাতি বা জাতিরাগের আকারে, দ্বিতীয়টি গ্রামরাগ ও তৃতীয়টি অভিজাত দেশী রাগের আকারে। আঞ্চলিক বা গ্রাম্য প্রাচীন সাঙ্গীতিক রূপের কথা আমরা না হয় ছেড়েই দিলাম, কেননা নাগরিক সভ্যতার মূল-উপাদান যেমন গ্রামীণ সভ্যতা, তেমনি রাগরাগীতি ও ক্ল্যাসিক্যাল গীতিরূপের আধার হিসাবে অনুন্নত সরল স্বচ্ছন্দবিহারী সুর বা গ্রাম্যগীতির অস্তিত্ব তো অবিসংবাদিত সত্য। বর্তমানসমাজে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল রূপের ছন্দবেশে যে সকল রাগের লীলায়ণ আমরা দেখি তাদের আদিরূপ তো আঞ্চলিক ও জাতীয় সুর বা গীতিকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছিল। আজ হয়তো সেই ইতিহাস আমাদের কাছে পরিস্ফুট না থাকতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতের প্রমাণযোগ্য ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন তার কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে সেই ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

খৃষ্টপূর্ব চার হাজার কিংবা সাড়ে তিন হাজার থেকে খৃষ্টপূর্ব ছ'শো বছরের কাল-ব্যবধানকে আমরা সাধারণভাবে 'বৈদিক যুগ' বলি। অবশ্য এরই ভেতর আবার প্রাক্‌বৈদিক যুগের অন্তর্নিবেশ আছে। এই প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক যুগের কাল-পরিসর নিয়ে বর্তমান অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদও কম নেই। কেননা ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে যে সব চিন্তাশীল মনীষী আজ নূতনভাবে গবেষণার কাজে ব্যস্ত আছেন তাঁদের মধ্যে সন্দেহের সঞ্চারও বড় কম হয়নি—ঐ প্রাগ্‌বৈদিক যুগই সত্যকারের বৈদিক সভ্যতার অধিকারী ছিল কিনা। যাই হোক, এই সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান-নির্ণয় ব্যাপারে ঐতিহাসিক আলোচনার কথা ছেড়ে দিলে অন্ততঃ প্রচলিত মতবাদাশ্রয়ী বৈদিক যুগের সমাজে আমরা পাই সামগানের নিদর্শন। সেই সামগান কি ধরণের ছিল, কিভাবে তাদের গাওয়া হ'ত, তাদের সহগামী বাদ্যযন্ত্রাদি কি কি ছিল ও কি রকম ছিল তাদের গঠন ও বাদনপ্রণালী—এ'সব তথ্য বৈদিক সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি থেকে আমরা পেয়ে থাকি।

বৈদিক যুগে সামগানে রাগের ব্যবহার ছিল কিনা এ'নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরা রাগের অস্তিত্ব সে যুগের গানে স্বীকার করেন না, অথচ গান ছিল, গানে চার থেকে সাত স্বরের ব্যবহার ছিল, গানের একটা প্রকাশভঙ্গি অবশ্যই ছিল, গানে স্থান (মন্দ্রাদি) ছন্দ, গতি ও রসের বিকাশও ছিল—একথা প্রমাণযোগ্য বৈদিক সাহিত্যগুলি থেকেই জানতে পারি।

এখন কথা হ'ল 'রাগ'—শব্দটির আসল সার্থকতা কি? যে স্বরসজ্জার বিচিত্র গতি মানুষের মনে আনন্দ ও রক্তিভাবের মন্দাকিনীধারা সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলি 'রাগ'। কথা এই যে, বৈদিক যুগে সামগ-ব্রাহ্মণেরা যে সামগান করতেন তাতে তাদের ও সর্বসাধারণের মন আনন্দরস-সিক্ত হ'ত কিনা, না মনোরঞ্জনের পরিবর্তে বৃথাই সুর দিয়ে কথার আবৃত্তি তাঁরা করতেন। তবে একথা কখনই আমরা বিশ্বাস করতে পারব না যে, মানুষে সে গানের (সামগান) সুরে আকৃষ্ট হ'ত না। কেননা বৈদিক সাহিত্যে আছে যে, দেবতারা, যক্ষ কিন্নর ও গন্ধর্বরা সেই গানে চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হত। সুতরাং সামগানের যুগে 'রাগ' এই নির্দিষ্ট আভিধানিক শব্দটির অস্তিত্ব না থাকলেও গানে সুরমাধুর্যের সঙ্গে লাবণ্যগুণযুক্ত রক্তিভাবের প্রকাশ ছিল, আর তারি জন্য মানুষ শুধু কেন, পশুপক্ষীরাও ছন্দায়িত সুরসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হ'ত। সুতরাং 'রাগ'-শব্দটির নিদর্শন না পাওয়া গেলেও ভিন্ন আকারে তার বিকাশ ও প্রভাব ছিল—যেমন ছিল রামায়ণ মহাভারতের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০—৩০০) বা নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের যুগে (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ)।

রামায়ণে সাতটি শুদ্ধজাতিরাগের উল্লেখ পাই তার চতুর্থ অধ্যায়ে কুশী-লব যখন তিনটি স্থানে লীলায়িত ক'রে রসে ও ভাবের সংমিশ্রণে রামায়ণগান করছে শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায়। বিকৃত জাতিরাগের তখন সৃষ্টি হয়নি দেখা যায়। শুদ্ধজাতিরাগের রূপ ও বিকাশভঙ্গি কি ধরণের ছিল তার খুঁটিনাটির পরিচয় দিয়েছেন মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ও শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন খৃষ্টীয় তেরশো অব্দের গোড়ার দিকে তাঁর আভিধানিক গ্রন্থ সঙ্গীতরত্নাকরে। এখনকার রাগে যেমন একটি বাদীস্বরের প্রয়োগ হয়, তখনকার রাগে তেমনটি ছিল না, একের অধিক বাদীস্বরেরও প্রয়োগ ছিল। বাদীস্বরকে বলা হ'ত অংশ বা অংশস্বর। অংশ বা বাদীস্বরের সার্থকতা হ'ল রাগের রূপকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করা। যে স্বরের বেশী প্রয়োগ, সে' স্বরই কিন্তু অংশ বা বাদীস্বর নয়, মোটকথা রাগের রক্তিভাব যে স্বরের ব্যবহারে প্রকাশ পায় সেই বাদীস্বর। অংশ বা বাদী প্রকাশ পেত তার অনুসঙ্গী সংবাদীস্বরকে নিয়ে। সংবাদীস্বর অংশ বা বাদীস্বরের সুষ্ঠু প্রকাশে সাহায্য করে। বাদী ও সংবাদীস্বর দুটির মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সংগতি বা স্বরসামোরও বিকাশ দেখা যায়। প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ অন্ততঃ খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্বরসংবাদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল মুনি নারদের কাছে। তিনি তাই স্বরসংবাদ তথা বাদী-সংবাদী স্বর-দুটির মাধ্যমে রাগরূপের লক্ষণ ও বিকাশবৈশিষ্ট্যেরও আবিষ্কার করেছিলেন। এই সংগতির জন্য রাগে শ্রুতিসামঞ্জস্যেরও প্রকাশ পায়। এখন মুনি ভরত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন সে' আবিষ্কার সত্যই নূতন ছিল—কি তাঁর পূর্ব আচার্য খৃষ্ট-পূর্ব যুগের ব্রহ্মভরতের কাছ থেকে সন্ধান পেয়েছিলেন এর সঠিক ইতিহাস এখনো আমাদের জানা নেই। আর জানা নেই বলে বেমালুম স্বীকার করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি যে খৃষ্টপূর্ব যুগে রাগও ছিল না আর তার অনুসঙ্গী বা নির্দেশক স্বর-সংবাদও ছিল না। অবশ্য আমাদের কথা

এই যে, প্রমাণযোগ্য ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ভবিষ্যতে রচিত হ'লে ছিল বা ছিল না মন্তব্যের আসল প্রামাণিকতা পাওয়া যাবে, ঠিক তার আগে নয়।

নাট্যশাস্ত্রের যুগে (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতের ধারা বজায় থাকলেও নূতন পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছিল। গ্রামরাগের প্রচলন ভরতের আগেকার যুগে তথা নারদীশিক্ষার সময়েই (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) পাওয়া যায়। নারদ (১ম) ষাড়ব, ষড়্জ-গ্রামাদি সাতটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। ভরতও "মুখে তু মধ্যমগ্রাম" প্রভৃতি ব'লে গ্রামরাগদের নামোল্লেখ করেছেন। মোটকথা জাতিরাগ, গ্রামরাগ তখন নাট্যপ্রয়োগে নাট্যগীতির আকারে প্রচলিত ছিল। গ্রামরাগকে অবলম্বন ক'রে অভিজাত দেশীরাগের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর তৃতীয় থেকে পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দী ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে একটি স্মরণীয় যুগ। কোহল, যাষ্টিক, মতঙ্গ এঁরা মুনি ভরতের মতানুবর্তী হলেও নূতন সঙ্গীতে নূতন পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। রাগশুদ্ধিযজ্ঞের আরম্ভ হয় তো ঠিক এই সময়ের ব্যবধানেই। কোহল, মতঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীরা দশলক্ষণের মহামন্ত্র দিয়ে দেশীয় ও জাতীয় বিচিত্র সুর-গুলিকে কৌলিন্যের মর্যাদা দিলেন ও বল্লেন তারাও রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট রাগ। বিদেশী সুরও বাদ গেল না। মালব, গুর্জর, ভোটদেশ, অন্ধ্র, কম্বোজ প্রভৃতি দেশ ছাড়া শক তথা সিথীয়ান, তুর্কী প্রভৃতি জাতিদের সুরগুলিকে শুদ্ধিযজ্ঞের মারফতে জাতে তুলে নেওয়া হয়েছিল। মূলরাগ, তার অঙ্গ বা ভাষা, তারও অঙ্গ বা ভাষা তথা বিভাষা প্রভৃতি রাগের বিকাশে সঙ্গীতের জগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং মানব-সমাজের মতো রাগের জগতে ক্রমবিস্তারের জন্য তার মধ্যে সুব্যবস্থার চাহিদা দেখা দিল।

অবশ্য এখনকার রাগ থেকে তখনকার রাগগুলির আকার ও প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট আলাদা ছিল। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, এখনকার মতো তখনকার (খৃষ্টীয় ৩য়—৫ম-৭ম শতাব্দী) রাগগুলিও মার্গশ্রেণীভুক্ত ছিল না। অথচ আজও ভুলবশত সংস্কার যুগের অভিজাত দেশীরাগগুলিকে আমরা বলি মার্গসঙ্গীতের রাগ। এরা মোটেই মার্গসঙ্গীতের রাগ নয়। কেননা মার্গসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের রাগের গঠন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী কিম্বা তারও কিছু পরেকার সমাজে। তবে মার্গসঙ্গীতের প্রকৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছিল দেশী-সঙ্গীতের রূপ। তাই আজকালকার ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতকে বড়জোর বলা যায় মার্গধর্ম বা মার্গ-প্রকৃতিসম্পন্ন সঙ্গীত বা রাগ। অবশ্য একথাও প্রয়োগ করা উচিত বিশেষ সাবধান সহকারে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে খৃষ্টীয় তেরশো শতাব্দীর সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি এ' সময়ের গীতিধারা ছিল রাগাশ্রয়ী ও তাদের বলা হ'ত 'রাগগীতি'। বৃহদ্দেশীতে মতঙ্গ রাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিচয় দিয়ে ভরত, কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, সার্দুল প্রভৃতি প্রাচীন পূর্বাচার্যদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিমতানুযায়ী রাগগীতিদের সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের মতে শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা এই সাত রকম গীতি তথা রাগাশ্রয়ী গীতি। তখন গীতি ও রাগ এতই পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিল যে, একটির নামোল্লেখ থেকে অপরটিকে বেছে নিতে কষ্ট পেতে হ'ত না। সঙ্গীতসময়সারে পার্শ্বদেব বিভিন্ন দেশী রাগের পরিচয় দিয়েছেন। শাঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে বিপুল বিচিত্র ভাবে সাঙ্গীতিক উপাদান নিয়ে বিভিন্ন দেশীরাগের পরিচয় দিয়েছেন। শাঙ্গদেবের গ্রন্থ সঙ্গীতের

একটি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া তথা বৃহৎ অভিধান বল্লেও চলে। তিনি রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গভেদে দু'শো চৌষট্টিটি অভিজাত দেশীরাগের পরিচয় দিয়েছেন :

সর্বেষামপি রাগাণাং মিলিতানাং শতত্রয়ম্।
চতুঃষষ্ট্যধিকং ব্রূতে শাঙ্গী শ্রীকরণাগ্রণীঃ ॥

অবশ্য তিনি জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলিরও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরই গ্রন্থ থেকে বরং রাগ-বিকাশের মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ধারণা আমরা পেতে পারি। নিবন্ধ প্রবন্ধ-গানগুলি তখন রাগকে নিয়ে বিকশিত ছিল। এককথায় তখনকার যুগে রাগাশ্রয়ী ছিল গান ও গান ছিল অনিবন্ধ ও নিবন্ধভেদে দু'রকম। অনিবন্ধ আলাপ বা আলপ্তিশ্রেণীর অন্তর্গত, আর নিবন্ধগান ছিল তালযুক্ত। মোটকথা অনিবন্ধ বন্ধনবিহীন বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণ করত রাগের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি রচনা ক'রে, আর নিবন্ধ বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও সীমার মাঝে অসীম মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে রাগমহিমা বিকাশ করত। রাগাশ্রয়ী গান কিংবা রাগগীতিগুলির আবার প্রকার ও শ্রেণীভেদ ছিল। তখনকার কালে রাগের বিচিত্র ও বিপুল বিকাশ ও প্রকৃতি দেখলে মনে হয়—ভারতের স্বাধীন ও পরাধীন দেশগুলির ভেতর শাস্ত্রীয় রাগ-সঙ্গীতের চর্চা কত বিস্তৃত ও সমাদৃত ছিল! অবশ্য অভিজাত শ্রেণীর পাশে গ্রাম্য সরল সাধারণ গানের পরিবেশন তো ছিলই।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের বিকাশ, বিস্তার ও অনুশীলনের ইতিহাস চমকপ্রদ। ভারতের রাগরূপ তার চৌহদ্দীর সীমানায় শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, গৌড় ও মগধরাজ্যকে কেন্দ্র ক'রে কাশ্মীর ও তিব্বতের ভেতর দিয়ে সমরকন্দ, ইয়ারকন্দ, কচ্ছ, খোটান, সুখ ছাড়াও চীন, জাপান, কোরিয়া, বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে, মধ্যএশিয়া ও এমন কি পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ব্যাপার ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নারদের (২য়) সঙ্গীতমকরন্দকে বেশীরভাগ গুণী খৃষ্টীয় সপ্তম—একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে যে রাগ-রাগিণী-পুত্র (উপরাগ ও উপরাগিণী) বর্গীকরণের শৈলী আছে তা কখনই ঐ সময়ের বিভাগ, পদ্ধতি বা রীতি নয়, তা খৃষ্টীয় তেরশো শতাব্দীর তথা শাঙ্গদেবেরও অনেক পরেকার। সুতরাং নানান্ কারণে আমরা সঙ্গীতমকরন্দকে শাঙ্গদেবেরও অনেক পরবর্তী গ্রন্থ বলে অনুমান করি। রাগের আলোচনা নিয়ে হঠাৎ সঙ্গীতমকরন্দের রচনাকালের বিবরণ দেওয়ার কারণ, সঙ্গীতমকরন্দে রাগের আলোচনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মকরন্দকার দুরকমভাবে রাগের বংশাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীতমকরন্দ ও সঙ্গীতরত্নাকরের পূর্ববর্তী মম্মটাচার্যের 'সঙ্গীতরত্নমালা', রাজা নান্যদেবের 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' সোমেশ্বরদেবের 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে ও রত্নাকরোত্তর গ্রন্থ নারদের (৩য়) 'পঞ্চমসারসংহিতা', রামামতোর 'স্বরমেলকলানিধি', পুণ্ডরীকের 'রাগমালা', 'সদ্গাচন্দ্রোদয়' ও 'রাগমঞ্জরী', অহোবলের 'সঙ্গীতপারিজাত', সোমনাথের 'রাগবিবোধ', লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে জন্য—জনক-বর্গীকরণের শৈলী অনুযায়ী অসংখ্য রাগের বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে তাদের অনেকগুলির অনুশীলন আর নাই, কিংবা তাদের বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টাও শিল্পী সমাজের নাই, অথচ নূতন নূতন রাগেরও সৃষ্টি চলেছে। অবশ্য প্রতিভার দানকে কোনদিনই আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বিগত প্রতিভার দানকে অবহেলাই বা কেন করি তার অর্থও বোঝা যায় না। তাই মনে হয়

সঙ্গীতের যথার্থ সাংস্কৃতিক আলোচনার দ্বার এখনো উন্মুক্ত হয়নি, গতানুগতিকেরই আমরা অনুবর্তী। তবে যেভাবে জাগরণের পালা শুরু হয়েছে—তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সঙ্গীতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল।

উত্তর-ভারতীয় ছাড়া দক্ষিণভারতীয় পদ্ধতিতে রাগের সংখ্যা অসংখ্য। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দুটি বিভাগীয় পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল খৃষ্টীয় তেরশো-চোদ্দশো শতাব্দীরও পরে, তার আগে সমগ্র ভারতে একটি পদ্ধতিরই বিকাশ ছিল, তবে গায়কীভঙ্গি ও দেশভেদে রাগ-বিকাশের ভেদ ছিলই। গোবিন্দ-দীক্ষিতের সুযোগ্য সন্তান বেঙ্কমখী তাঁর পূর্বাচার্য মাধব-বিদ্যারণ্য প্রভৃতির মেলপদ্ধতিকে গ্রহণ করলেও তাঁদের থেকে নূতনভাবে বাহাত্তর মেল তথা মেলকর্তার প্রচলন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সময়েই সকলগুলি মেলের ঠিক ঠিক অনুশীলন হ'ত না, হ'ত মাত্র উনিশটি মেলকর্তার।

রাগের জগতে রুচি ও সম্প্রদায়ভেদে মতবাদের মাধ্যমে মতভেদ দেখা দিল ও তাথেকে ভাল ও মন্দ দুরকম পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। রাগের অনুশীলন মুসলমান রাজত্বের সময়ে বেশী হয়েছিল বই কমে নি। তবে আলমগীর অওরঙ্গজেবের পর থেকে ইংরাজ রাজত্বের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাগের অনুশীলনে দৈন্য দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে সমগ্র ভারতে আবার রাগ-সঙ্গীতের অনুশীলন বেড়ে চলেছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র প্রেরণা ও প্রচার এ' বিস্তৃতিকে অনেকটা সাহায্য করেছে।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা ভারতের রাগকে রক্ত-মাংসের শরীর দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, প্রাণ-স্পন্দনও জাগিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুনি ভরতই জাতিরাগগুলিকে আট রস ও ভাবে লীলায়িত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভরতকে অনুসরণ করে পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রীরাও রাগের অধ্যাত্মিক রূপের মহিমাকে খর্ব করেন নি, বরং বাড়িয়েই তুলেছিলেন। রাগের অনুশীলনের পেছনে দর্শনশাস্ত্রের কাঠামো গড়ে উঠেছিল মানে সঙ্গীত যে সাধনার সামগ্রী ও সঙ্গীত সাধনার ভেতর দিয়ে কল্যাণসুন্দর ভগবানকেও যে প্রত্যক্ষ বা দর্শন করা যায় একথারই মর্মকাহিনী প্রকাশ করছে। রাগের ইতিকথা ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তরে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। ভারতের রাগরাগিণী শুধু জড়ধর্মবিশিষ্ট স্বরের কাঠামো নয়, পরন্তু প্রাণবান ও তারা দীপ্ত প্রেরণাই মানুষকে দান করে।

শঙ্করের বিবর্তবাদ বা সৎকারণবাদ

রমা চৌধুরী

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মতে কারণ ও কার্য সর্বকালে, সর্বাবস্থায় অনন্য বা অভিন্ন। তাই যদি হয়, তাহলে তার প্রকৃত অর্থ এই যে, হয় কারণই কার্য এবং কেবল কারণই সত্য; নয় কার্যই কারণ এবং কেবল কার্যই সত্য; অর্থাৎ, কেবল একটী মাত্র সত্তাই আছে, যেহেতু অভিন্নতা স্থলে দুটী সত্তা থাকতে পারে না। যেমন, যদি বলা হয় যে, 'ঘট ও পট অভিন্ন' তাহলে হয়, ঘটই পট এবং পটই একমাত্র সত্তা, অথবা পটই ঘট এবং ঘটই একমাত্র সত্তা। এস্থলে শঙ্করের মতে, প্রথম পক্ষই যুক্তিসঙ্গত, দ্বিতীয় নয়; অর্থাৎ, কারণই কার্য, এবং কেবল কারণই সত্য। সেজন্য তিনি বলছেন—

"অনন্যত্বেঽপি কার্য-কারণয়োঃ কার্যস্য কারণাত্মত্বং, ন তু কারণস্য কার্যাত্মত্বম্।" ব্রহ্মসূত্র ২।১।৯, শঙ্করভাষ্য)। অর্থাৎ, কার্য ও কারণ অনন্য হলেও, কার্যই কারণাত্মক, কারণ কার্যাত্মক নয়।

বস্তুতঃ, শঙ্করের মতে, একমাত্র কারণই সত্য, কার্য মিথ্যাই মাত্র। শঙ্করের এই মতবাদের নাম 'বিবর্তবাদ' বা 'সৎকারণবাদ'। এরূপে 'সৎকার্যবাদ' থেকে 'কার্যকারণোনন্যত্ববাদ' এবং 'কার্যকারণোনন্যত্ববাদ' থেকে 'বিবর্তবাদ', বা 'সৎকারণবাদ' নিষ্পন্ন হয়। 'সৎকার্যবাদ' মতে, সৃষ্টির পূর্বে এবং লয়ের পরেও কার্য কারণেই নিহিত হয়ে থাকে। সেজন্য কার্য কারণ থেকে অনন্য; সেজন্য কারণই একমাত্র সত্য; সেজন্য কার্য মিথ্যা। এরূপে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে, শঙ্কর একটী মতবাদ থেকে অপরটীতে উপনীত হয়েছেন।

সৎকার্যবাদ দ্বিবিধ—পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ পরিণামবাদ মতে, সৎকারণ থেকে সৎ বা সত্য কার্যের সত্যই সৃষ্টি হয়। যেমন, মৃত্তিকা থেকে ঘট ও দুগ্ধ থেকে দধির সৃষ্টি হয়। এস্থলে, মৃত্তিকা সত্যই ঘটে, এবং দুগ্ধ সত্যই দধিতে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়। সেজন্য, ঘট মৃত্তিকার এবং দধি দুগ্ধের 'পরিণাম'। সুতরাং কারণ ও কার্য, মৃত্তিকা ও ঘট বা দুগ্ধ ও দধি সমভাবে সত্য ও বাস্তব। পরিণামবাদ হল সাংখ্য-যোগ ও রামানুজপ্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণের মত।

বিবর্তবাদ মতে, সৎকারণ থেকে সত্যই কোনো সত্য কার্যের উৎপত্তি হয় না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কারণে মিথ্যা কার্য প্রতীতি হয়। যেমন, রজ্জুকে সর্পরূপে, বা শুক্তিকে মুক্তা-রূপে ভ্রম করলে, রজ্জু সত্যই সর্পে বা শুক্তি সত্যই মুক্তায় পরিণত হয় না। রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্প মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র, বাস্তব সত্য নয়। সেজন্য, সর্প রজ্জুর ও মুক্তা শুক্তির 'বিবর্তই' মাত্র 'পরিণাম' নয়। এস্থলে, কারণ বা রজ্জুই একমাত্র সত্য, কার্য বা সর্প নয়। বস্তুত, কারণ থেকে কার্যোৎপত্তিই হয় না বিবর্তবাদ শঙ্করপ্রমুখ একাত্মবাদী বা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মত।

এরূপে, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের প্রভেদ সংক্ষেপে এই ঃ—

"সতত্বোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্বোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিত।"

অর্থাৎ, সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হলে, তাকে বলা হয় "বিকার" বা "পরিণাম।" কিন্তু

সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার না হলেও যদি সেরূপ মিথ্যা প্রতীতি হয়, তাহলে তাকে বলা হয় "বিবর্ত"।

বিবর্তের সংজ্ঞা দান করে আচার্য সারণ মাধব তাঁর সুবিখ্যাত "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" বলছেন—

"স্বরূপাপরিত্যাগেন রূপান্তরাপত্তি বিবর্ত ইতি সত্যমিথ্যাখ্যাবভাস ইতি। অবভাসো-ধ্যাস ইতি পর্যায়ঃ।" (শঙ্কর-দর্শনম্)

অর্থাৎ, স্বরূপ পরিত্যাগ না করেও, অন্যরূপ প্রাপ্তির নাম "বিবর্ত"। এক্ষেত্রে সত্য 'রজ্জু' ও মিথ্যার 'সর্পের' মধ্যে অভিন্ন প্রতীতি হয়—এবং এরূপ প্রতীতিই "অধ্যাস"।

শঙ্করের মতে, পরিণামবাদমূলক সৎকার্যবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই মতে, প্রথমতঃ সৎকারণটী একটী তুল্যসত্য কার্যে তুল্যসত্যভাবে পরিণত, রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সৎকার্যটী একটী নূতনরূপ বা আকার ধারণ করে, সৎকারণটী থেকে অভিব্যক্ত হয়। এ দুটীই অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

প্রথমতঃ, যা সৎ বা সত্য তার ত পরিণাম, পরিবর্তন বা বিকার অসম্ভব, তা' সম্পূর্ণ নির্বিকার।

দ্বিতীয়তঃ, যদি স্বীকার করা হয় যে, কার্য একটী নূতন, সত্য; বা বাস্তব রূপ বা আকার ধারণ করে, কারণ থেকে আবির্ভূত হয়, তাহলে সৎকার্যবাদ ভঙ্গ হয়—যেহেতু সেই আকারটী ত কারণে পূর্বে নিহিত হয়ে ছিল না।

তৃতীয়তঃ, দৃশ্যতঃ কার্য কারণ থেকে আকারতঃ বিভিন্ন হলেও, বস্তুত, আকারগত ভেদের জন্য বস্তুগত ভেদ হয় না, সেজন্য, কার্যকে কারণ থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা' নয়।

চতুর্থতঃ, আকার যদি বস্তুসত্তা থেকে বিভিন্নই হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কোনোরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন করাও অসম্ভব।

এরূপে, কোনোদিক থেকেই, পরিণামবাদ বা কারণের সত্য কার্যে পরিণতির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সেজন্য, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কার্য একটী সত্য বস্তু, প্রকৃতপক্ষে কার্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর তথাকথিত 'কার্য', 'পরিণাম' বা 'বিকারের' দুটী প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করে বলছেন—

"দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ এবমস্য ভোগা-ভোক্তৃতাদি প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪, শঙ্কর-ভাষ্য)

অর্থাৎ, তথাকথিত 'কার্য', 'পরিণাম' বা 'বিকারের' দুটী প্রধান লক্ষণ হল ঃ "দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপত্ব" এবং "স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্ব।" এরূপে, প্রথমতঃ কার্যের বাস্তব সত্তা নেই, তা' কেবল ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষই মাত্র, মানসিক চিন্তাই মাত্র, সেজন্য যতক্ষণ তা' দৃষ্ট হয়, ততক্ষণই তার তথাকথিত অস্তিত্ব—তার পূর্বে বা পরে নয়। যেমন, রজ্জু-সর্প-ভ্রমকালে, যতক্ষণ ভ্রমটা থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের সর্প প্রত্যক্ষ হয়, ততক্ষণই সর্পটীর অস্তিত্ব থাকে—অবশ্য বাহিরের জগতে নয়, কেবল আমাদের প্রত্যক্ষে, আমাদের মনে, কিন্তু সেই ভ্রমের অবসান হলে, সর্প-প্রত্যক্ষের বিলয় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে, সর্পও তিরোভূত হয়ে যায়, তার আর কোনোরূপ অস্তিত্বই থাকে না। সেই জন্যই বলা হয়েছে যে, কার্য "দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ", অথবা প্রথমে সত্যরূপে দৃষ্ট হয়, অথচ পরে সেই প্রত্যক্ষের বিলয় হ'লেই নিজেও নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ কার্যটী সম্পূর্ণরূপেই অনির্বচনীয়—তার স্বরূপ কোনোরূপেই ব্যাখ্যা করা যায় না, যেহেতু তা' সৎও

নয়, অসৎও নয়। সেই জন্যই বলা হয়েছে যে, কার্য "স্বরূপেণ অনুপাখ্য।"

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য। সেটী হল এই যে, শঙ্করের মতে, সর্প-ভ্রম ও জগদ-ভ্রম একই প্রণালীতে উদ্ভূত হলেও, শেষেরটী উচ্চস্তরীয়।

সেজন্য, শঙ্করের মতে, বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্যরূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও, বস্তুতঃ ব্রহ্ম—জীব-জগতে পরিণত হন না—সংসার রজ্জু-সর্পবৎ মিথ্যা, মায়াই মাত্র। প্রকৃত সৃষ্টি বলে কিছুই নেই, ব্রহ্মও স্রষ্টা কারণ নন, ব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্ট কার্য নয়। অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের 'পরিণাম' নয়, 'বিবর্তই' মাত্র।

শঙ্করের মতে, সৃষ্টি প্রক্রিয়া রজ্জু-সর্প-ভ্রম প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। আমরা যেমন রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করি, ঠিক তেমনি ব্রহ্মকেও বিশ্ব বলে ভ্রম করি। এরূপ ভ্রমের লক্ষণ ও কারণ কি? প্রথমতঃ লক্ষণের কথা ধরা যাক! ভ্রম দুপ্রকার হতে পারে ঃ সাধার ও নিরাধার। প্রথম-ক্ষেত্রে, ভ্রমের একটী আধার বা অবলম্বন আছে। অর্থাৎ, কোনো একটী বস্তু সত্যই সেই ভ্রমকারীর সম্মুখে থাকে, এবং সেই বস্তুটীকেই সে অন্য এক বস্তু বলে ভ্রম করে। যেমন, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করলে, ভ্রমকারীর সম্মুখে সত্যই একটী রজ্জু থাকে, কিন্তু সে রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ না করে, সর্পরূপেই প্রত্যক্ষ করে, অথবা, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করে (Illusion)। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, কোনো বস্তুই ভ্রমকারীর সম্মুখে থাকে না, অথচ সে একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করে। যেমন, শূন্য ঘরে হঠাৎ মৃত বন্ধুর মূর্তি দর্শন, বা একটী সর্প দর্শন (Hallucination)। এরূপে, প্রথম ক্ষেত্রে ভ্রম একটী বস্তু, আধার বা অবলম্বনকে আশ্রয় করেই উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তা নয়। এই বস্তু, আধার বা অবলম্বনকে বলা হয় ঃ 'অধিষ্ঠান'। ভ্রমকালে, এরূপ অধিষ্ঠানে অন্য এক বস্তুর গুণ-কর্মাদি আরোপ করা হয় বলেই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। যেমন, রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করা হয় কেন? তার কারণ হল এই যে, রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে অন্য এক বস্তু বা সর্পের গুণ-কর্মাদি আরোপ করা হয়; এবং প্রকৃত-পক্ষে, রজ্জু ও সর্প দুটী ভিন্ন বস্তু হলেও, এই আরোপের ফলে, তারা অভিন্ন বলে প্রতীত হয়, অথবা রজ্জুকেই সর্প বলে মনে হয়। এক বস্তুর উপর অপর এক ভিন্ন বস্তুর এরূপ ভ্রমাত্মক আরোপ, অর্থাৎ, দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভ্রমাত্মক অভেদ প্রতীতির নাম "অধ্যাস"। যেমন, রজ্জু ও সর্প দুটী ভিন্ন বস্তু। অথচ তাদের অভিন্ন প্রতীতি, বা রজ্জুতে রজ্জুদৃষ্টির স্থলে সর্পদৃষ্টির নাম "অধ্যাস"। এস্থলে রজ্জুরূপ 'অধিষ্ঠানে' সর্প 'অধ্যস্ত' হয়ে রজ্জুতে সর্প-প্রত্যক্ষরূপ-ভ্রমের সৃষ্টি করেছে।

অন্য আরেক দিক থেকেও ভ্রম দুপ্রকারের ঃ সদর্থক বা ভাবার্থক, এবং নঞর্থক বা অভাবার্থক। প্রথম ক্ষেত্রে, একটী সত্যবস্তুর বিষয়েই যে কেবল জ্ঞানের অভাব থাকে, তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই স্থলে আরেকটী মিথ্যাজ্ঞানেরও উদয় হয় (Positive Mal-observation)। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র, সত্যজ্ঞানেরই অভাব থাকে, মিথ্যাজ্ঞানের অস্তিত্ব নয় (Negative Non-observation)। যেমন, রজ্জুটী আমাদের সম্মুখে থাকলেও, তা' কেবল-মাত্র রজ্জু বলে না জেনে সঙ্গে সঙ্গে সর্পও বলে জানা—এই হল প্রথম শ্রেণীর ভ্রম। কিন্তু কেবলমাত্র তা' রজ্জু বলে না জানা—এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রম। এই ভাবে, রজ্জু-সর্পভ্রম হ'ল সাধার বা বস্তুআশ্রয়ী এবং ভাবার্থক ভ্রম।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ রজ্জু-সর্প-ভ্রমের কারণ কি? কারণ হ'ল সেই ভ্রমকারীর রজ্জু-

প্রত্যক্ষের অভাব, অর্থাৎ রজ্জু সম্বন্ধে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ করলে, বা রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে কেহ রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করতে পারেনা। সেজন্য রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই ভ্রমের মূল কারণ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই রজ্জু-সর্প-ভ্রম কেবল অভাবাত্মক বা সত্যজ্ঞানের (অর্থাৎ, রজ্জুজ্ঞানের) অভাবই মাত্র নয়, সেই সঙ্গে ভাবাত্মক বা মিথ্যাজ্ঞানরূপীও (অর্থাৎ, সর্পজ্ঞানরূপী) নিঃসন্দেহে। সেজন্য, ভ্রমের মূল কারণ, অজ্ঞানেরও ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক দুটী কার্য বা শক্তি। অভাবাত্মক শক্তির নাম "আবরণশক্তি", এবং ভ্রমের অভাবাত্মক দিকের কারণ হল এটী। ভাবাত্মক শক্তির নাম "বিক্ষেপ-শক্তি" এবং ভ্রমের ভাবাত্মক দিকের কারণ হল এটী। এরূপে, আবরণশক্তিশীল অজ্ঞান প্রথমে সত্য আধার বা অধিষ্ঠানটীর (রজ্জুর) স্বরূপ আবৃত করে দেয়—এই কারণে, সত্য রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হয়। সেইসঙ্গে, বিক্ষেপশক্তিশীল অজ্ঞান আবৃত রজ্জুর স্থলে মিথ্যা সর্পের বিক্ষেপ করে। মিথ্যাসর্পের যেন সৃষ্টি করে—অর্থাৎ রজ্জুটীকে যেন এরূপভাবে বিকৃত করে' দেয় যাতে তা' সর্পরূপেই প্রতিভাত হয়—এই কারণে, মিথ্যা রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হয়। এরূপে, আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানই অধ্যাসের জনক, এবং অধ্যাসই এরূপ সাধার ও ভাবাত্মক-ভ্রমের জনক।

শঙ্করের মতে, রজ্জু থেকে যে প্রক্রিয়ায় মিথ্যা সর্পের উদ্ভব হয়, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই ব্রহ্ম থেকেও মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ নয়। কিন্তু, অজ্ঞানবশতঃ, জীব সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের আরোপ বা অধ্যাস করে, এবং ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভ্রম করে। এরূপে, জীবাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে। 'ব্রহ্মই সত্য' এই সত্যজ্ঞান থেকে আমাদের বঞ্চিত করে। অপরপক্ষে, সেই অজ্ঞানই ব্রহ্মস্থলে যেন বিশ্বের সৃষ্টি করে—'বিশ্বই সত্য' এই মিথ্যাজ্ঞানেরও সৃষ্টি করে। এরূপে, জীবের দিক থেকে, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই মিথ্যা জগতের কারণ।

ব্রহ্মের দিক থেকে, তাঁর ভ্রম সংঘটক 'মায়া' শক্তিই মিথ্যা জগতের কারণ। এই শক্তি কিন্তু ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, এবং ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নয়।

অগ্নি থেকে উষ্ণতা যেমন স্বতঃই ও স্বভাবতই উৎসারিত হয়, অথচ, উষ্ণতা অগ্নিভিন্ন নয়—ব্রহ্ম ও মায়ার ক্ষেত্রও ঠিক তাই।

ভাষাতত্ত্বে—শব্দকথা

ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গোচর প্রকৃতি শব্দ।

সকল ভাষাতেই আমরা দেখিতে পাই কোন কোন সামান্য-বাচক শব্দ ক্রমশঃ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে, আবার কোন কোন বিশেষবাচক শব্দ ক্রমশঃ সামান্যবাচিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ভারতীয় ভাষাগুলিতে গোশব্দঘটিতপদগুলি প্রায়ই সামান্যার্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। গোচর-শব্দটীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

পাণিনির একটী সূত্রে * ঘ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের তালিকায় গোচরশব্দের উল্লেখ আছে। গাবশ্চরন্ত্যত্র অর্থাৎ গোরুরা এই স্থলে চরিয়া বেড়ায় এইভাবে অধিকরণবাচ্যে গোচরশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গোচরশব্দের অর্থ—গোচরণের মাঠ। আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে এই অর্থে গোচর-শব্দ দৃষ্ট হয়।

কঠোপনিষদের সময়েই শব্দটী সাধারণীকৃতির দিকে একটু অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে পাই। কঠোপনিষদে (১।৩।৩—৪) আছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব বলিয়া থাকেন, আর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে তাহাদিগকে গোচর বলিয়া থাকেন। মনীষিগণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

এ স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গোচর-শব্দটী গোচারণের মাঠ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া অশ্বের বিচরণ স্থান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কুমারসম্ভবে আছে—

অকিঞ্চনঃ সন প্রভবঃ সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসম্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥

তিনি কপর্দকশূন্য হইলেও সমস্ত সম্পদের মূল, তিনি শ্মশানে বাস করেন অথচ তিনি ত্রিভুবনের নাথ (রক্ষক), তাঁহার রূপ ভীষণ অথচ তাঁহাকে শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় বলা হয়। পিনাকধারী মহাদেবের সত্য স্বরূপ কেহই জানে না।

এ স্থলে পিতৃসম্ম-গোচর-শব্দের অর্থ পিতৃসম্ম অর্থাৎ শ্মশান হইয়াছে গোচর অর্থাৎ বাসস্থান যাঁহার তিনি। গোচর শব্দের গোরুর বিচরণ স্থান হইতে অর্থ হইল শুধু বিচরণ স্থান।

* গোচর-সঞ্চর-বহ-ব্রজ-ব্যজাপণনিগমাশ্চ। ৩।৩। ১১৯

রঘুবংশে (১০।২৫) আছে—

প্রণিপত্য সুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরাদ্বিষাম্।
অথৈনং তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙ্মনসগোচরম্॥

তাহার পর অসুরবিনাশক বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া বাঙ্মনঃপথাতীত স্তত্যর্হ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে অবাঙ্মনসগোচর-শব্দের অর্থ—যিনি বাক্য ও মনের গোচর নহেন অর্থাৎ বাক্য ও মন যতদূর বিচরণ করে বা করিতে পারে তাহা অতিক্রম করিয়া যিনি অবস্থিত।

কিরাতার্জুনীয়ে (৮।২৮) আছে—তরঙ্গ মালান্তর গোচরোঽনিলঃ অর্থাৎ তরঙ্গমালার মধ্যে গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান যাহার এরূপ বায়ু। কিরাতার্জুনীয়ে অন্যত্র (১৪।৫৫) আছে—অরুন্তুদত্বং মহতাং হ্যগোচরঃ, অর্থাৎ মর্মপীড়া মহদ্‌গণের বিচরণ স্থান নহে, অর্থাৎ মর্মপীড়া মহদ্‌গণের অবিষয়।

এইরূপে ইন্দ্রিয়গোচর শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় যতদূর বিচরণ করিতে পারে তাহা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, ইন্দ্রিয়পথাতিক্রান্ত, ইন্দ্রিয়বিষয়াতীত, beyond the range of the senses. এরূপস্থলে টীকাকারগণ অর্থ করেন—গাব ইন্দ্রিয়াণি চরন্ত্যত্র গোচরম্। এরূপ অর্থ অত্যন্ত ক্লিষ্ট। আর যখন পূর্বোক্তপ্রকারে সহজেই অর্থ করা যাইতেছে তখন এরূপ কষ্টকল্পনা অনাবশ্যক।

এইরূপে সংস্কৃতে গোপাশব্দের অর্থ যিনি গোরুকে রক্ষা করেন, গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। (পরবর্তী সংস্কৃতে ও বাঙলায় অন্যান্য অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় এই শব্দটীও অকারান্ত হইয়া গিয়াছে।) ক্রমশঃ গোপাশব্দের অর্থ গোরক্ষক হইতে সাধারণভাবে রক্ষক হইল। ঋগ্বেদে আমরা পাই—গোপামৃতস্য দীদিবিম্ (১।১।৭), যজ্ঞের দেদীপ্যমান রক্ষক। ভুবনস্য গোপাঃ (১০।১৭।৩) লোকের রক্ষক। গোপাশব্দ হইতে নামধাতু হইল—গোপায়, অর্থ গো-রক্ষকের মত আচরণ করা, তাহা হইতে সাধারণীকরণের ফলে অর্থ হইল রক্ষা করা। এই গোপায় দেখিয়া লোকের ধারণা হইল ইহার মূলে গুপ একটী ধাতু আছে, ফলে রক্ষণার্থ গুপ ধাতুর সৃষ্টি হইল, আর গোপয়তি শব্দের অনুরোধে বৈয়াকরণগণ তাহার উত্তর স্বার্থে আয় প্রত্যয় করিতে বাধ্য হইলেন*।

গবেষণাশব্দের অর্থ গোরুর জন্য ইচ্ছা, গোরুর অন্বেষণ। ফলে ধাতুপাঠে একটী গবেষ ধাতু যোগ করিতে হইল। আজকাল এই research-এর যুগে ত সর্বত্র গবেষণা গম্ গম্ করিতেছে। মহাভারতে আছে—অহেরিব হি ধর্মস্য পাদং দুঃখং গবেষিতুম্ অর্থাৎ সর্পের পদের ন্যায় ধর্মের পদও অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর।

গোব্যূতি শব্দটী সম্ভবতঃ গো উতি এই দুইটী শব্দের সমাসের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক অর্থ গোরুর রক্ষণ বা খাদ্য যে স্থানে আছে অর্থাৎ গোচারণের মাঠ। ক্রমশঃ উহার সাধারণভাবে অর্থ হইল প্রদেশ বা বাসস্থান। এদিকে তখনকার দিনে গোচারণের মাঠ দুই ক্রোশ-ব্যাপী হইত বলিয়া গব্যূতি শব্দের অর্থ দেখা যায় দুই ক্রোশ। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের মতে গো যূতি এই দুইটী শব্দ সমস্ত হইয়া গব্যূতি আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন—একবার শকটে বৃষ যুক্ত করিয়া দুই ক্রোশ যাওয়া হইত, সেইজন্য গব্যূতি অর্থ দুই ক্রোশ, ঠিক যেমন খোলা মাঠে চীৎকার করিলে শব্দ এক ক্রোশ পর্যন্ত যাইত বলিয়া ক্রুশ ধাতু

* গুপূ-ধূপ-বিচ্ছি পণি পণিভ্য আয়। ৩।১।২৮

নিষ্পন্ন ক্রোশশব্দ দুই মাইল বোঝায়।

গোষ্ঠশব্দের অর্থ—যেখানে গোরুরা দাঁড়াইয়া থাকে। ঋগ্বেদে আছে—নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্ (১।১৯১।৪)। গোষ্ঠে অনেক গোরু একসঙ্গে থাকে বলিয়া যেখানে অনেকে একত্র হইয়া নানাবিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে গোষ্ঠী বলা হয়। আবার অর্থের সাধারণীকরণের ফলে গো-গোষ্ঠ বলিলেও পুনরুক্তি দোষ হয় না, মহিষ-গোষ্ঠ বলিলেও উদ্বেগ হয় না। মনুসংহিতায় আছে—গবাং গোষ্ঠে (৪।৫৮)।

গোযুগ শব্দের অর্থ একজোড়া গোরু, ক্রমশঃ উহা শুধু একজোড়া অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, ফলে বৈয়াকরণগণকে গোগোযুগম্, উষ্ট্রগোযুগম্ প্রভৃতি শব্দের সাধুত্বের জন্য সূত্র করিতে হইল—গোষ্ঠাদয় স্থানাদিষু পশুনামাদিভ্যঃ (৫।২।২৯ সূত্রের দ্বিতীয় বার্তিক।) অর্থাৎ পশুনামবাচকশব্দের উত্তর ও অন্যান্য শব্দের উত্তর স্থান প্রভৃতি অর্থে গোষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

এইরূপ ষড়্‌গশব্দের অর্থ তিন জোড়া গোরু, কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণীকরণের ফলে অর্থ দাঁড়াইল—তিন জোড়া। ফলে গোষড়্‌গবম্ উষ্ট্রষড়্‌গবম্ প্রভৃতি প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

গোময়শব্দের প্রাথমিক অর্থ—গোরূপ, যেমন গোময়ং বসু (ঋগ্বেদ ১০।৬২।২) অর্থাৎ গোধন। তাহার পর অর্থ হইল গোরুর বিকার, তাহা হইতে বিশেষীকরণের ফলে গোরুর বিষ্ঠা অর্থাৎ গোবর দাঁড়াইল। তাহার পর সাধারণীকরণের ফলে অর্থ হইল যে কোন চতুষ্পদ প্রাণীর বিষ্ঠা। ফলে উষ্ট্র-গোময় (উটের গোবর), খর-গোময় (গাধার গোবর) প্রভৃতি প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

গোপতিশব্দের অর্থ—গো ও বলীবর্দসমূহের অধিপতি, কিন্তু ক্রমশঃ উহা সাধারণভাবে অধিপতি, প্রধান, নেতা অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদে (১।১০১।৪) আছে—যো অশ্বাগং যো গবাং গোপতির্বশী, অর্থাৎ যিনি অপরাধীন আর যিনি অশ্বগণের ও গোগণের অধিপতি।

গোস্বামীশব্দের প্রাথমিক অর্থ—গোরুদের স্বামী বা মালিক। ব্যাকরণের মূর্ধাভিষিক্ত উদাহরণ (stock examples)—গবাং গোষু বা স্বামী। ক্রমশঃ সাধারণীকরণের ফলে অর্থ দাঁড়াইল যে কোন মালিক, প্রভু বা বড়লোক। পুনরায় বিশেষীকরণের ফলে অর্থ দাঁড়াইল—আধ্যাত্মিক জগতে বড়।

পুরোগশব্দের অর্থ—গোযূথের অগ্রগামী বৃষ। তাহা হইতে অর্থ হইল পুরোগ, অগ্রগামী, নেতা। আবার পুরোগবীশব্দের অর্থ হইল নেত্রী, ঋগ্বেদে আছে—জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী (১০।১৩৭।৭), জিহ্বা বাক্যের নেত্রী। অথর্ববেদে আছে—ইন্দ্র এতু পুরোগবঃ (১২।১।৪০) নেতা ইন্দ্র আসুন।

বৌদ্ধ সাধনা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সত্য উপলব্ধি করে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করলেন ও চোয়াল্লিশ বৎসর ধরে তিনি যে সত্য প্রচার করেছিলেন সেই আর্যসত্যের মূল কথা হচ্ছে এই যে দুঃখ হচ্ছে সব উৎপত্তি-গত জীবনের ধর্ম, এই দুঃখের মূল হচ্ছে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা—তন্‌হায় জায়তী সোকো, তন্‌হায় জায়তী ভয়ং, তন্‌হায় বিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভয়ং?—ধম্মপদ; দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব ও এই দুঃখ দূর করবার আর্টটি উপায় বা পথ আছে।

বৌদ্ধধর্মের মতে এই দুঃখ হচ্ছে মানুষের নিজের কর্মের ফলস্বরূপ। এই দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে ও করবে শুধু নিজের প্রচেষ্টায়—আত্মোপলব্ধির দ্বারা। ভগবানের মধ্যস্থতায় দুঃখ দূর হবে না। ভগবানের মধ্যস্থতা বৌদ্ধধর্ম মানে না। ভগবৎকৃপার স্থান তাই মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টাতেই নিজেকে ও সামাজিক আবেষ্টনীকে বদল করতে পারে ও নেই বৌদ্ধসাধনায়। মানুষ তার সামাজিক আবেষ্টনী তৈরী করেছে, নিজেকে তৈরী করেছে। অতিক্রম করতে পারে। এটা ক্রমাভিব্যক্তির পথ ধরেই ঘটবে। যাঁরা বুদ্ধ তাঁরা যুগে যুগে এই পথই দেখিয়ে গেছেন।

বৌদ্ধধর্ম-মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে নয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে উচ্চ আদর্শের দিকে, আর্য-সত্যের দিকে পরিচালিত করেই মানুষ মুক্তি পাবে। ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্রে দেখি বুদ্ধদেব গুরু পারাশার্থ-এর শিষ্যকে প্রশ্ন করে যখন জানলেন যে তাঁর গুরু তাঁকে এমন করে ইন্দ্রিয়নিরোধ করতে বলেছেন যাতে ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব কার্য—দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি—থেকে বিরত হয়, তখন বুদ্ধদেব এই শিক্ষাকে অর্থহীন শিক্ষা বল্লেন। তিনি বল্লেন এই শিক্ষা যদি মানুষকে মুক্তি দিতো তাহোলে অন্ধ, বধির প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দোষাক্রান্ত লোকেরাই তো শ্রেষ্ঠ সাধক। বুদ্ধদেবের মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে তুচ্ছ পার্থিব বস্তুতে আবদ্ধ না রেখে প্রথমে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান বা 'সংজ্ঞা' লাভের চেষ্টা করতে হবে। এই সংজ্ঞার সাহায্যে 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। তারপরে এই বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞানের সহায়তায়, 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ অনুভূতিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সবশেষে এই প্রজ্ঞার সাহায্যে 'বোধি' অর্থাৎ সাক্ষাৎ-উপলব্ধিজাত জ্ঞান লাভ হবে। এই হচ্ছে প্রকৃত দর্শন, সর্বোত্তম জ্ঞান। বৌদ্ধধর্ম আষ্টেপৃষ্ঠে-বাঁধা শাস্ত্র-মতের জ্ঞানের চেয়ে এই বোধিকে অনেক উচ্চে স্থান দেয়। এই জ্ঞানের ফলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পায় ও পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম-মতে সত্য-উপলব্ধি সত্যের উপর বিশ্বাস বা ভক্তি থেকে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় মানুষের জন্যে। এই সত্য উপলব্ধি করতে গেলে আর্টটি বস্তুর প্রয়োজন—(১) উচিত জ্ঞান (২) উচিত উদ্দেশ্য (৩) উচিত বাক্য (৪) উচিত কর্ম (৫) উচিত জীবিকা-অর্জনের উপায় (৬) উচিত চেষ্টা (৭) উচিত সজাগতা ও (৮) উচিত একাগ্রতা।

উচিত জ্ঞান

এই উচিত জ্ঞান কাকে বলে? সব ভৌতিক দ্রব্য, ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান, এসব অনিত্য এই চেতনাই হচ্ছে উচিত জ্ঞান। ঘটনা, দ্রব্য ও ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি বস্তুত যা অর্থাৎ

অনিত্য, এই চেতনা-লাভ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করবার জন্যে সাধককে হিংসালেশ-শূন্য জীবন যাপন করতে হবে ও ধ্যান (ভাবনা) করতে হবে; তবে অজ্ঞানতার হাত থেকে ও অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে তার মুক্তি হবে। এই জ্ঞান-লাভের পথে সাধক যতো এগোবে ততই তার মন থেকে লোকিয় ভাব অর্থাৎ এই লোক-সংক্রান্ত ভাবগুলি—ঝরা পাতার মতো খসে পড়বে। সাধকের চেতনা এক উচ্চতর চিৎভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উচিত উদ্দেশ্য

যে জ্ঞান বা সত্য উপলব্ধি করা হয়েছে সেই জ্ঞান বা সত্যকে জীবনের সর্ব কার্যে প্রতি-ফলিত করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা উচিত উদ্দেশ্য। জ্ঞানলাভ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞান জীবনের প্রতিটি কাজে আপনাকে স্বপ্রকাশ না করে সে জ্ঞান নিষ্ফল থেকে যায়। যে মানুষ জ্ঞান লাভ করে তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, তার বাক্যে, আচরণে ও কর্মে সেই জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, সে মানুষ জীবনে জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে নি; তার জ্ঞান বন্ধ্যা।

দুই জাতের কিম্বা দুই স্তরের উদ্দেশ্য আছে, একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, আর একটি হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই সংসারের সীমার মধ্যে জ্ঞানের বা সত্যের প্রকাশ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের লক্ষ্য। চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বোধি লাভ করে সব আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া বা নির্বাণলাভ করা।

উচিত বাক্য

সত্য ও করুণা-সিক্ত বাকাই উচিত বাক্য। যে বাক্য জ্ঞানের উৎস থেকে নিঃসারিত হয়নি, শুধু অজ্ঞানতা ও সংস্কারের অন্ধ অভ্যেস থেকে জন্ম লাভ করেছে, সেই বাক্য নিরর্থক। যে বাক্য মানুষের প্রতি প্রেমের রসে সরস নয়, উজ্জ্বল নয়, সে বাক্য মৃত বাক্য। জ্ঞান ছাড়া করুণা সম্ভব নয়। জন্মমৃত্যুর চক্রে জীব বাঁধা রয়েছে এই জ্ঞান থেকেই করুণার উদ্ভব।

উচিত কর্ম

শান্তিময়, সৎ ও পরহিতকারী কর্মই উচিত কর্ম। যে কর্ম সংঘাত সৃষ্টি করে কিম্বা সংঘাতের সম্ভাবনা ঘটায়, সে কর্ম অনুচিত কর্ম, অমঙ্গলের হেতু। সৎ কর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যা জ্ঞান-প্রসূত, যা নিছক জড়-অভ্যাসজাত নয়। জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসা আছে, বিচার আছে। সৎ কর্ম বিচারমূলক লৌকিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ। যে কর্ম মানুষের কল্যাণ করে না সে কর্ম একেবারে নিষ্ফল। পরহিতকারী কর্মের প্রেরণা দেয় জ্ঞান ও করুণা। জ্ঞান ও করুণা মানুষকে আত্মাভিমানের খণ্ডতা-দোষ দূর করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের অনুভূতি দেয়। সেই অনুভূতি মানবহিতকারী কর্মের প্রেরণা যোগায়।

জীবিকা অর্জনের উচিত উপায়

যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করলে কারো ক্ষতি করা হয় না কিম্বা জীবিকা অর্জন কারো দুঃখের কারণ হয় না, জীবিকা-অর্জনের সেই উপায়ই হচ্ছে উচিত উপায়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সোজাসুজি ভাবে জীবিকা-অর্জনের ব্যাপারটিকে ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করে নি। এটি বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য। জীবিকা অর্জন যেন কোনো উপায়ে করা যেতে পারে, তার সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো যোগ নেই—এই হোলো শিক্ষিত(!) সমাজের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা! এই সর্বনেশে প্রবঞ্চনাকে আঘাত হেনেছে বৌদ্ধ মতবাদ। মানুষের জীবনের কোনো অংশকেই ধর্ম-সাধনা থেকে বাদ দেবার উপায় নেই। তার আহার-বিহার-

চিন্তা-অনুভূতি সব এক সূত্রে বাঁধা। একটি জায়গায় কলুষ স্পর্শ করলে সব কলুষিত হবে। সকালে চোরাকারবার করে সন্ধ্যে বেলা ধার্মিক সাজা যেতে পারে, সাজছেও লোকে এই সমাজে, কিন্তু ধার্মিক হওয়ার কোনো উপায় নেই।

উচিত চেষ্টা

চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবার, সংযত করবার চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। কামনার হাওয়ায় চিন্তা সতত আন্দোলিত, জ্ঞানের অনড়ভূমিতে চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। কামনার আলেয়ার পেছনে কর্মনিয়ত প্রধাবিত, মানব-কল্যাণের চেতনার আলোকে কর্ম উদ্ভাসিত হতে পারছে না। কামনার এই অসংযত ও ব্যর্থ ছোটাছুটি ও হয়রাণির হাত থেকে চিন্তা ও কর্মকে বাঁচানোর চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। যা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকবার প্রয়াস, যা সকলের হিতকারী তা সাধন করবার প্রচেষ্টা, কামনা ও অজ্ঞানতা অতিক্রম করবার নিরন্তর সংগ্রাম, নির্বাণের পথে অগ্রসর হবার জন্যে অবিরাম সাধনা—এই হচ্ছে উচিত চেষ্টা।

উচিত সজাগতা

ব্যক্তিগত জীবনের ও সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের বিভিন্ন চিন্তাধারার ও কর্মের কারণ ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে সজাগতাই হচ্ছে উচিত সজাগতা।

জীবনের পথ দিয়ে মানুষ চলে যায়, চলে যায় যেন তন্দ্রার ঘোরে। তন্দ্রার ঘোরে চলতে চলতেই তার জীবনের অবসান ঘটে মৃত্যুর জাগরণহীন নিদ্রায়। অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কার এরা দুটি হোলো ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, আমাদের চেতনাকে এরা সব সময়েই জড়তার ও অজ্ঞানতার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে। তার ফলে অন্তরের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় না, মানব-প্রেম জাগে না, কর্ম জ্ঞানের সংস্পর্শ লাভ না করে মানুষের কল্যাণ-সাধনের শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সজাগতার এতো প্রয়োজন। শরীর ও মন সম্বন্ধে সজাগতা, অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিচারশীল সজাগতা, বর্তমানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানসিক সজাগতা। এই সজাগতা থাকলেই মানুষ জ্ঞান লাভ এবং চিন্তায় ও কর্মে মহীয়ান হয়।

উচিত একাগ্রতা

সব চিন্তা বাদ দিয়ে বিশেষ একটি চিন্তার উপর মনকে কেন্দ্রস্থ করা ও প্রতিষ্ঠিত করাই হোলো উচিত একাগ্রতা। মন যেন হরিণ সে কেবলই ছুটে বেড়ায় অন্তর ও বাহিরের বনবনান্তরে। কোথাও তার স্থিতি নেই, তাই অস্থির মন কোনো বস্তুর সত্তার স্পর্শ পায় না। কেবল জীবনের উপরে উপরেই মনের যাওয়া-আসা, তাই কোনো বস্তুর সত্তার আস্বাদন করা তার ভাগ্যে ঘটে না। অথচ মন সত্তার আস্বাদ পেতে পারে ও মনের প্রকৃত কার্যই হোলো বস্তুর সত্তার প্রকৃত আস্বাদন। মন যখন এই উচিত একাগ্রতার সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সমাধি প্রাপ্ত হয় তখন পন্না অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় ও মনের অন্তর্দৃষ্টির বন্ধ দরজা খুলে যায়। এই একাগ্রতা (অথবা সমাধি) দুই রকমের —প্রাথমিক একাগ্রতা (উপকার সমাধি) ও পূর্ণ একাগ্রতা (অপপনা সমাধি)। উচিত একাগ্রতা লাভের পরে আত্মপ্রত্যয়মূলক চিন্তা (intuitive thinking) সুরু হয়। মহাযানীদের মধ্যে যাঁরা 'জেন' সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁরা 'সতরি' অর্থাৎ এক ঝলক সত্য-লাভে বিশ্বাস করেন। আত্মশুদ্ধি অবশ্য অনেক কাল ধরে চলেছে তার আগে।

এই প্রাথমিক একাগ্রতা সাধনার জন্যে কতকগুলি বস্তুর সাহায্য নেবার নির্দেশ আছে। এই

বস্তুগুলিকে 'কসিন' বলা হয়। কসিন দশ প্রকার—মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, জল, লাল রঙ, নীল রং, শাদা রং, হলদে রং, আলো ও বিস্তৃতি।

ছুটন্ত মনকে সব কিছুর থেকে গুটিয়ে এনে একটি বিশেষ কিছুর মধ্যে সমাহিত করবার জন্যে এই কসিনগুলির সৃষ্টি। কসিনগুলি যে কোনো একটিকে নিয়ে মন যদি আপনাকে স্থিরতা ও সংযম শিক্ষা দেয় তাহোলে কাজ এগোলো। এটা কিন্তু নিছক প্রাথমিক একাগ্রতার জন্যে প্রয়োজন। তারপরে কসিনগুলির আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মন আপনার সুপ্ত শক্তিকে উদ্ধার করে নিয়েছে জড়তার আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চৈতন্য-উদ্ভাসিত মনের আর বাইরের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

ধ্যানকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভাবনা' বলা হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন যে "ধ্যান ছাড়া জ্ঞান নেই, জ্ঞান ছাড়াও ধ্যান নেই। যার ধ্যান আছে ও জ্ঞান আছে, সে-ই এই ভৌতিক জগতে বস্তুর (reality) কাছাকাছি পৌঁচেছে।"

'ভাবনা'-র (ধ্যানের) জন্যে মনকে কঠোর শিক্ষা দেওয়া দরকার। মন চারিদিকে দৌড়তে চায় আগুনের শিখার মতো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় পারার মতো। তাকে স্থির করতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ধ্যান ছাড়া মন আত্ম-সমাহিত হয় না আর যে মন সমাহিত নয় জ্ঞান তার কাছে ধরা দেয় না। তাই ভারতীয় সাধনায় ভাবনা (ধ্যান) এতো গুরুত্ব লাভ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ভাবনা দুরকমের—(এক) সমাধি ভাবনা (দুই) ভিপশ্যনা ভাবনা।

সমাধি ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক মনের একমুখিনত্ব লাভ করেন। মন তখন নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে নানা বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয় না। মন তখন একাভিমুখিন হয়ে স্থিরতা ও অচঞ্চলতা লাভ করে। তখন চারিদিকের ভৌতিক দ্রব্য তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না। ভৌতিক-দ্রব্য-সংস্পর্শ-জাত উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেয়ে মন প্রশান্তি লাভ করে। সমাধি ভাবনায় মনকে একবার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে মনকে স্থির করবার জন্যে বহির্জগতের কোনো দ্রব্যের অর্থাৎ কসিনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না। ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান তখন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখিনতা প্রাপ্ত হয়। এই ধ্যানের পথে মন শুচিতা লাভ করে ও ইন্দ্রিয়-পরবশতা সম্পূর্ণ-ভাবে অতিক্রম করে। তখন মন চারটি বিশেষ ecstatic অবস্থা প্রাপ্ত হয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই অবস্থাগুলিকে 'ঝানস্' বলা হয়। সমাধি ভাবনার চারটি ঝানস্-এর সর্বোত্তম ঝানস্ লাভ করলে শরীর ও মনের শান্তি ও অলৌকিক আনন্দ লাভ করা যায়। এই অবস্থায় পৌঁছলে সাধক পাঁচটি বুদ্ধিজাত-উপলব্ধি লাভ করেন। এই বুদ্ধিজাত-উপলব্ধিকে 'অভিজ্ঞা' বলা হয়। এই পাঁচটি অভিজ্ঞা হচ্ছে—(এক) অপ্রাকৃতিক আশ্চর্য ক্ষমতালাভ (দুই) দিব্য দৃষ্টি (তিন) দিব্য শ্রবণ (চার) পূর্বজন্ম-স্মরণ (পাঁচ) অন্যের চিন্তা ও মানসিক ক্রিয়া বোঝবার ক্ষমতা।

এগুলি কিন্তু 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) লক্ষ্য নয়। এই 'অভিজ্ঞা'-লাভ সাধনার নিম্নস্তরের বস্তু। যিনি এই সব ক্ষমতা-লাভের মোহে আবদ্ধ হলেন তাঁর ধ্যান ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেন না ক্ষমতা-লাভের জন্যে ধ্যান নয়, ধ্যান হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্যে। তাই যে সাধক এই 'অভিজ্ঞা'-প্রাপ্তির পরেও এগোতে চান তাঁকে 'কিসন'-এর সাহায্যে রূপ-ভাবনা থেকে অরূপ-ভাবনায় (অরূপ-ধ্যান) যেতে হবে। এই উপায়ে সাধক অরূপলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যেমন 'অভিজ্ঞা'-প্রাপ্তি সাধকের চরম লক্ষ্য নয়, তেমনি অরূপলোক-প্রাপ্তিও সাধকের চরম উদ্দেশ্য নয়। 'সমাধি-ভাবনা'-র চতুর্থ 'ঝানস্'-এ পৌঁছে সাধক 'ভিপশ্যা ভাবনা'-র দিকে তাঁর মনকে চালিত করবেন।

(দুই) ভিপস্সনা ভাবনা

ভিপস্সনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক বস্তুর আত্মপ্রত্যয়জাত (intuitive) জ্ঞান লাভ করেন। ভিপস্সনা-ভাবনা-সিদ্ধ সাধক কার্য-কারণের শৃঙ্খলে-বাঁধা আমাদের এই হেতু-ভূত অস্তিত্বের তিনটি লক্ষণ উপলব্ধি করবেন—(এক) অনিত্যতা (দুই) দুঃখময়তা ও (তৃতীয়) সব ভৌতিক পদার্থের বস্তুহীনতা।

এই যে সমাধি-ভাবনা ও ভিপস্সনা-ভাবনা, রূপ-ভাবনা ও অরূপ-ভাবনা, এই 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) বিষয় হচ্ছে চল্লিশটি—দশটি 'কসিন', দশটি অশুভা, একটি আহারের দোষ (আহারে পতিকূলসঞ্জা), একটি ভূত-বিশ্লেষণ (চতুধাতুববত্থানম্), দশটি স্মরণ (অনুস্সতি), চারটি ব্রহ্ম-বিহার ও চারটি অরূপ-ঝানস্।

দশটি 'কসিন'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। দশটি অশুভ জিনিস, আহারের দোষ অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর প্রতি লোভ এগুলি বর্জন করবার জন্যে মনকে এদের সম্বন্ধে জাগ্রত করতে হবে, হুঁশিয়ার করতে হবে। তার পরে ভূত-বিশ্লেষণ। প্রতিটি দ্রব্যের ধাতুগত বিশ্লেষণ করতে হবে তাতে তাদের অনিত্যতা-বোধ সম্বন্ধে মন নিঃসংশয় হবে। তার পরে দশটি 'অনুস্সতি' (স্মরণ) ধ্যানের বিষয় হবে। সেই দশটি 'অনুস্সতি' হচ্ছে—বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শীল, দান, দেব, শান্তি (উপসম) মৃত্যু, দেহের প্রতি মনযোগ (কায়গতা সতি), ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি (অনাপানা সতি)। এর পরে চারটি ব্রহ্মবিহার হবে ধ্যানের বিষয়। এই চারটি বিষয় হচ্ছে—(এক) মেত্তা (দুই) করুণা (তিন) মুদিতা (চার) উপেক্ষা। মেত্তা হচ্ছে প্রেম, তবে অন্ধ প্রেম নয়, নিরাসক্ত প্রেম। অন্ধ প্রেম থেকে কাম ও তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। এই অন্ধ প্রেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,—এই অন্ধ প্রেমের ছায়া হচ্ছে বিদ্বেষ। করুণা সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে এই করুণা জ্ঞান-জাতা। জীব জীব-মৃত্যুর শৃঙ্খলে-বাঁধা, সংসার-চক্রে পিষ্ট—এই জ্ঞান যথার্থ ভাবে লাভ হলে জীবের প্রতি যে জ্ঞান-উদ্ভূত অনুভূতি তারই নাম করুণা। মুদিতা হচ্ছে অচঞ্চল স্থির আনন্দ। এ আনন্দ বোধি লাভের ফল। মন অসংশয় ভাবে বস্তু-র (reality) জ্ঞান লাভ করে সব ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি শেষ করেছে। বোধি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মন পূর্ণ চৈতন্যময় হয়ে আনন্দ ভোগ করছে। উপেক্ষা হচ্ছে মনের সেই প্রশান্ত অবস্থা যখন সুখদুঃখ সব সমান বলে মনে হয়। যখন জীব-অস্তিত্বের পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় তখন অস্তিত্বের ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি করে সুখদুঃখ সব সমান বলে প্রতীয়মান হয় মনের কাছে।

চারটি অরূপ-ঝানস্ হচ্ছে—(এক) অসীম বিস্তারের ক্ষেত্র (আকাশানান্সায়তন) (দুই) চেতনার অনন্তবোধক্ষেত্র (ভিঞ্ঞানন্সায়তন) (তিন) নির্বস্তুতার ক্ষেত্র (অকিঞ্চায়তন) ও (চার) অনুভূতি-নয় অ-অনুভূতিও-নয় সেই ক্ষেত্র (নেভসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন)। প্রথম ঝানস্-এ ধ্যানের বিষয় বিশ্লেষণ করে চিন্তা করা হয়। বাসনা ও কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, নিরাসক্তির আনন্দ অনুভব করে সাধক প্রথম লোকোত্তর আনন্দলোক প্রাপ্ত হন।

প্রথম ঝানস্-এ থাকে—(এক) বিশ্লেষণ (ভিতক্ক) (দুই) চিন্তা (ভিকার), (তিন) আনন্দ (পিতি), (চার) সুখ (সুখ), (পাঁচ) চিত্ত-একাগ্রতা (চিত্ত-একাগ্গতা সমাধি)।

দ্বিতীয় ঝানস্-এ থাকে আনন্দ, সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। বিশ্লেষণ ও চিন্তার পৈঠা থেকে মন, উঁচু পৈঠায় পৌঁছয়। এই ঝানস-এর ফলে মনে সুগভীর চিন্তা ও আনন্দ উপলব্ধি স্থায়িত্ব-লাভ করে। তৃতীয় ঝানস্-এ থাকে সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। আনন্দ বাদ হয়ে যায় এই ঝানস্-এ কেন না আনন্দ অনিত্য। এই অবস্থায় মন অত্যন্ত একাগ্র ও চৈতন্যময় হয়। চতুর্থ ঝানস্-এ শুধু থাকে

নির্বিকার ভাব। সুখে দুঃখে সমভাব। এই সমভাব প্রাপ্ত হলেই সাধক রূপ, বেদনা (sensation) বুদ্ধিগ্রাহ্যতা (সঞ্ঞা), সু এবং কু কর্মের জনক মনের অবস্থাগুলি ও ক্রিয়াগুলি(সংখারা) ও চেতনা (ভিঞ্ঞান)—এই পাঁচটির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে। এই পাঁচটি হচ্ছে ব্যক্তির স্কন্ধ অর্থাৎ অস্তিত্বের গুণ। এই পাঁচটি নিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

এই ঝানস্ সিদ্ধ হোলে লোকত্তর জ্ঞান (অভিঞ্ঞা) ও লোকত্তর ক্ষমতা (ইদ্ধি) লাভ হয়। বৌদ্ধ সাধনার উদ্দেশ্য কিন্তু অভিঞ্ঞা-ও নয় ইদ্ধি-ও নয়—উদ্দেশ্য নির্বাণ।

ভাবনা-র (ধ্যানের) এই চল্লিশটি বিষয়ের মধ্যে ব্যক্তি বিষয় নির্বাচন করে কি করে? বৌদ্ধ-শাস্ত্র মতে ব্যক্তির চরিত্রের উপর বিষয় নির্বাচন নির্ভর করে। ব্যক্তির চেতনার যে অবস্থা সেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তি ধ্যানের বিষয় বেছে নেয়। চেতনার এই রকম কুড়িটি অবস্থা আছে। অভিধম্ম পিটক গ্রন্থে এই বিভিন্ন চেতনার বিশদ আলোচনা আছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে চেতনাকে শুধু চেতনা ও অবচেতনা এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে এই বিভাগের সংখ্যা কুড়ি।

যে সব চিন্তা মানুষের অন্তরের রোগস্বরূপ, সেই সব চিন্তার বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছে যে সেগুলি অজ্ঞানতার ফল। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে মনের এই চিন্তাগুলির আট লক্ষ চুরাশি হাজার মিশ্রণ সম্ভব। এই চিন্তার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং এই চিন্তা কতো রূপ দিতে পারে তাই দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, অজ্ঞানতা-প্রসূত এই চিন্তাগুলিকে কি করে রোধ করা যায় তার উপায় বাত্লিয়েছে বৌদ্ধশাস্ত্র।

আমরা দেখেছি যে ধ্যানের বিষয় নির্বাচন ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্যক্তির এই চরিত্র কিসের উপর নির্ভর করে? বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে ব্যক্তির চরিত্র নির্ভর করে—(এক) তার দেহের প্রকৃতির উপর (দুই) তার বংশগত চরিত্রের উপর (তিন) তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর—আবেষ্টনীর উপর (চার) তার নিজের কর্ম ও কর্ম-ফলের উপর।

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ব্যক্তির চরিত্রের উপাদান ও হেতু বিশ্লেষণ বৌদ্ধশাস্ত্রের তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দেখে। আধুনিক মনবিজ্ঞান কিম্বা সমাজবিজ্ঞান এর চেয়েও বেশী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় নি মানুষের চরিত্রের হেতু বিশ্লেষণে। প্রতিটি ব্যক্তির দেহের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে কেন না প্রতিটি দেহই একটি বিশেষ মিশ্রণের ফল। অতএব একজন ব্যক্তির দেহের এই বিশেষ প্রকৃতি তার চরিত্রের বিশেষ প্রকৃতির জন্যে আংশিক ভাবে দায়ী। ব্যক্তি তো শুধু কার্য-কারণ-রহিত ভুঁইফোড় জীব নয়। অস্তিত্ব হচ্ছে ধারা, জীব-অস্তিত্বও ধারা। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান। জীব-অস্তিত্বে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ হচ্ছে বংশগত সম্বন্ধ। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে ব্যক্তি যেমন দেহের উপাদান পায় যা তার দেহের চরিত্র নির্ণয় করে, তেম্নি মানসিক উপাদানও পায় যা তার মনের বিশেষ গঠনের হেতু। আধুনিক কালে বায়লজি ও জেনেটিক্স্ যা বলছে heredity সম্বন্ধে, দুহাজার বছর আগে বৌদ্ধ বিজ্ঞান সে কথা পরিষ্কারভাবে বলে গেছে। তারপরে এলো আবেষ্টনীর (environment) প্রভাব ব্যক্তির চরিত্র গঠনে। দেহের ও মনের বংশগত উপাদানগুলির উপর ব্যক্তির হাত নেই কিন্তু আবেষ্টনীর উপর মানুষের হাত আছে। আবেষ্টনী সামাজিক অবস্থার ফল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করলে আবেষ্টনী বদল করা যায়। ব্যক্তির চরিত্রের উপর এই আবেষ্টনীর প্রভাব আজকাল সর্বজনস্বীকৃত। তবে কোনো কোনো লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে আবেষ্টনীর যতোটা প্রাধান্য দেয় সে প্রাধান্য উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্বদোষদুষ্ট।

বৌদ্ধ মত বিজ্ঞানসম্মত মত, তাই তাতে সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যনির্ণয় ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। চতুর্থ ও শেষ প্রভাব ব্যক্তির চরিত্রের উপর হোলো তার কৃত কর্মের। যে কর্ম আমরা করি সে যেমন আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির দ্বারা নির্ণীত তেমনি যে কর্ম আমরা করি সেই কর্ম আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও আবেষ্টনী—এই তিনটিকে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত করে। বৌদ্ধমত ব্যক্তির জীবনের উপর কর্মফলের প্রভাব স্বীকার করে কিন্তু নিছক্ কর্মফলের হেতু ব্যক্তির চরিত্র একটি বিশেষ রূপ পায় এটি স্বীকার করে না। বহু কারণের সমন্বয়ে মানবচরিত্র গঠিত,—একটি দেহ-জাত কারণ, একটি বংশ-জাত কারণ, একটি সামাজিক কারণ ও একটি কর্ম-প্রসূত কারণ।

ব্যক্তির চরিত্রের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধ শাস্ত্র ক্ষান্ত দেয় নি, চরিত্র-হিসেবে ব্যক্তিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগও করেছে—(এক) কামুক (দুই) ক্রোধপরায়ণ (তিন) অ-জ্ঞানী (চার) অবিশ্বাসী (পাঁচ) অল্পে-বিশ্বাসী (ছয়) জ্ঞানী।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সংযমী, বিগত-ক্রোধ ও সত্যনিষ্ঠ। জ্ঞানের ভিতরই সংযম, ক্রোধশূন্যতা ও নিষ্ঠা আছে বলেই পৃথক করে সংযমী, বিগতক্রোধ ও নিষ্ঠাবানের কথা বলার প্রয়োজন হয় নি।

এই ভাবে ভিপশ্যনা ভাবনা-র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধক জ্ঞানের পয়ঁত্রিশটি নীতির চর্চা করবেন। এই পয়ত্রিশটি নীতিকে 'বোধিপক্ষিয় ধম্ম' অর্থাৎ বোধি-অনুকূল ধর্ম বলা হয়। এই নীতিতে সিদ্ধি লাভ করলে সাধকের মন সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, সাধক নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

এই নির্বাণ লাভ করতে গেলে যে দশটি শৃংখলে (সম্যোজন-এ) প্রাণী শৃংখলিত সেই শৃংখলগুলি ছিন্ন করতে হবে। সেই দশটি হচ্ছে—(এক) আত্ম-মায়া (দুই) অবিশ্বাস (তিন) রীতি ও পদ্ধতিতে আসক্তি (চার) কাম (পাঁচ) দ্বেষ (ছয়) রূপ-জগৎ সম্বন্ধীয় বাসনা (সাত) অরূপজগৎসম্বন্ধীয় বাসনা (আট) অহংকার (নয়) উত্তেজনা ও (দশ) অবিদ্যা, অজ্ঞানতা।

যে সাধক আত্ম-মায়া, অবিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতিতে আসক্তি-মুক্ত হয়েছেন তিনি নির্বাণ-প্রাপ্তির প্রথম পৈঠায় পৌঁচেছেন। তাঁকে 'সোতাপন্ন' বলা হয়, সোতাপন্ন-র মানে যিনি নির্বাণের স্রোতে নেমেছেন।

যে সাধক কাম ও দ্বেষ জয় করেছেন তাঁকে 'সকদাগামিন' বলা হয়। তিনি নির্বাণের দ্বিতীয় পৈঠায় পৌঁচেছেন। সেই সাধক মাত্র আর একবার এই পৃথিবীতে আসবেন।

যে সাধক আত্মমায়া, অবিশ্বাস, রীতি-পদ্ধতি, কাম ও দ্বেষ জয় করেছেন তিনি 'অনাগামিন', তিনি কাম-লোক থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি আর এই লোকে ফিরবেন না। শুদ্ধ-রূপ-লোকে তাঁর বাস হবে। এটি নির্বাণের তৃতীয় পৈঠা।

যিনি এই দশটি শৃংখল ছিন্ন করেছেন তিনি অরহৎ, তিনি বুদ্ধ, তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। এইটি হচ্ছে নির্বাণলাভের শেষ পৈঠা।

এই নির্বাণ-পথ-যাত্রী সাধককে শাস্ত্রের উপর কিম্বা গুরুর উপরে নির্ভর করলে চলবে না। এ পথে সাধককে নিজের পথের আলো হতে হবে নিজেকেই। কেন না তথাগতেরা হচ্ছেন

"তুম্হেহি কিচ্চমাতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা
পটিপন্না পমোক্খন্তি জায়িনো মারবন্ধনা।" ধম্মপদ

আশ্বিন আকাঙ্ক্ষা

সন্তোষ দাস

অবসন্ন ভাদ্রের আকাশে
পেঁজানো তুলোর মেঘ, শিশুর সরল হাসি হাসে,
ঘাসে রোদ্দুর—
কাশে কী ঝালর ঝোলে, আশ্বিন আর কত দূর?

মখমলের মত ঘাস, সবুজ সবুজে
সমস্ত দিনের দাহ, চোখ আসে বুজে
অসহ্য আরামে—
দিগন্ত ময়ূর নীল, মেঘ থম থমে।

এখনিতো ছেড়ে যাবে, রাঁচী এক্সপ্রেস
ধোঁয়ার নিশান তুলে, এতটুকু রেশ
ট্রেণের বাঁশীর—
যদি ভুলে কানে আসে, দেহ শিরশির!

ছুটির ছুটন্ত শব্দ, পলাতক হরিণের মত
ক্লান্ত কেরাণীর কানে, আশ্বিন আশ্বাস আনে যত
সবই বৃথা হায়—
পথ কী রঙীণ হবে দুদণ্ডে আলতায়?

আশ্বিন আকাঙ্ক্ষা তার, তাই বুঝি কাশে ও আকাশে
নরম তুলোর মেঘ, দামাল শিশুর হাসি হাসে।

পারাবত

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উড়ে যায় শাদা পারাবত।
নীলশূন্য ভেঙে দিয়ে ডানায় ডানায়
ভেসে চলে যায় ঃ
স্বর্গগামী রথ।
ডানার ঝাপট লেগে ঃ রথের চাকার তলে গুঁড়ো-গুঁড়ো পথ।
উড়ে যায়, উড়ে যায় শাদা পারাবত।

স্বর্গ সে কোথায়?
শুধুই অসীম শূন্যে ডানা ঝাপ্টায়
পারাবত দুটি শাদা-শাদা;
(স্বর্গ কি কোথাও আছে? সে প্রশ্নের হয়না সমাধা)
তবু বুঝি স্বর্গ থাকে নীল-নীল মেঘে-মেঘে বাঁধা।

পারাবত উড়ে চ'লে গেছে,
উড়ে-উড়ে স্বর্গ-সিঁড়ি পার কি হয়েছে?
গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে কি বাধা সে তারার—
শত-শত মেঘ-অন্ধকার?
তারপর বুঝি আছে স্বর্গের ঠিকানা!
জানিনা, উধাও শুধু পারাবত-ডানা।

পারাবত নয়-নয় আমাদের মন,
হৃদয়ের নীলশূন্যে করে বিচরণ।

ছায়া

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

পুড়েছে ঘর ভেঙেছে বুঝি আশা
চৈতী তাপে সবুজ ভালোবাসা
শুকিয়ে গেছে! পথের দিকে চেয়ে
এখনো সেই সর্বহারা মেয়ে
গুনছে ছায়া—নিবিড় নীরবতা
ছায়া ত নয়—বুকের ব্যাকুলতা।

সে মেয়ে তবে মরবে জ্বলে পুড়ে
দেখেছি খুঁজে হৃদয়টাকে খুঁড়ে
এই আগুনে একটুখানি ছায়া
একটুখানি ধূসরমনের মায়া
কোথাও নেই। পেয়েছে যাকে কাছে
গড়তে গিয়ে নিজের মনের ছাঁচে
ভেঙেছে কেউ; কেউ বা গেছে ছেড়ে
আবার কেউ হৃদয়টাকে কেড়ে
পালিয়ে গেছে।

পুড়ুক ঘর—ভাঙুক তবে আশা
ছায়া ত নেই—ছায়াই দুরাশা
ফাল্গুনে যে কান্না বয়ে আনে—
কাঁদাও তাকে, লুকাবে কোনখানে!

ভুলবে ব্যথা প্রাণের উল্লাসে
এই আকাশে শ্রাবণ যদি আসে।

মৃত্যুর অতীত

শ্যামদাস সেনগুপ্ত

শীতে উত্তরের বাতাস পেতেছে মৃত্যুর সাথে মিতালী,
জীবনের স্বপ্নে যেন দোলে মৃত বাগানের ফুলগুলি,
পাতা ঝরে. . .
জীবনের বিদীর্ণ পাতার পরমায়ু ঝরে মৃত্যুর সাগরে।

হিংস্র হাওয়ার অহরহ প্রবাহ
বিয়োগান্ত কাহিনীর বিবর্ণ পাতায়
মৃত্যুর নিঃস্বরূপ রেখাঙ্কিত ক'রে যায়।
তবু পউষের এই শীত
মৃত্যুর অতীত।

সবুজ ফুলশাখে বসন্তে বর্ণ ও গন্ধের কলরব
আনে পরম প্রশান্ত ঃ অমৃত সৌরভ।

শীতের ধূসর শ্মশানে মৃত্যুর অপরূপ গান
ডাক দিয়ে যায় বিকশিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান
বিকাশের বিস্তৃতি মরণের স্পর্শে, ছোঁয়ায়,
শাখার শিখরে
নৃত্যরতা পাতা, ফুল; ঊর্ধ্বমুখী তাই।

প্রতিশোধ

সরিৎশেখর মজুমদার

ঝাড়ুদার রূপলালকে এই প্রথম এতোখানি রাগতে দেখলো সকলে। একেবারে অবাক কাণ্ড অমন যে দুঁদে সতরোশো টাকার সেক্রেটারী, যার দাপটে গোটা অফিসটা থরহরি কম্প, রূপলাল হাতের ঝাড়ু পটকে তারই মুখের ওপর সাফ জবাব দিলো—

—জরিমানাকা ডর্ হাম্‌কো মাত্ দিখ্‌লাও। হম্ নহি শকেগা।

অর্থাৎ, আমি পারবো না। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। সেক্রেটারী প্রভুরাম আগরওয়াল অবাক হয়ে গেলেন। অশিক্ষিত 'মিনিয়ল', উত্তেজিত হয়েছে। হয়তো আরও অপমান করে বসবে। অফিসের কয়েকজন কর্মচারী এপাশ-ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে শুনছে সব। শুনছে রূপলালের দুঃসাহসিক প্রতিবাদ। এক্ষেত্রে মান বাঁচিয়ে সরে যাওয়াই শ্রেয়। যেন শুনতেই পাননি, কিংবা ক্ষমাই করলেন রূপলালকে,—এমন নির্লিপ্তভাবে বাগানের একটা টুকটুকে গোলাপ পট্ করে ছিঁড়ে বাটনহোলে লাগাতে লাগাতে এগিয়ে গেলেন লিফটের দিকে।

খট্ করে সেলাম ঠুকলো লিফটম্যান রহমান। লিফটের দরজা বন্ধ হলো, ঝপাং। চক্ষের পলকে সাহেবকে নিয়ে ওপরে উঠে গেল যন্ত্র।

—সেলাম হুজুর!

—গুড্ মর্ণিং স্যার!

—দণ্ডবত!

চারপাশে প্রভুর উদ্দেশ্যে নুয়ে পড়ছে মাথা। ঝুঁকে পড়ছে কোমর পর্যন্ত দেহ। প্রত্যভিবাদনের বালাই নেই। জাত-অফিসারের কাজ হলো শুধু হন্‌হন্ করে এগিয়ে যাওয়া। সেলাম করতে যারা জন্মেছে, তারা করুক।

—সরকার!

নিজের ঘরের দিকে যাবার পথে পাইপ-কামড়ানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা সম্বোধন শুধু।

সেইটেই যথেষ্ট। 'ইয়েস স্যার' বলে হড়বড় করে চেয়ার ছেড়ে সাহেবের ঘরের দিকে ছুটলেন বড়বাবু শ্রীশক্তিপদ সরকার।

সাহেব খদ্দরের গান্ধীটুপিটা খুলে ভাঁজ-বাঁচানো সন্তর্পণে হুকে টাঙালেন। তারপর কোট খুলতে খুলতে বললেন,—রূপলালের ফাইল!

—অল্‌রাইট স্যার!

অবাক বড়বাবু। কি হলো হঠাৎ?

অফিসে ঢুকেই রূপলালের ফাইল? কই, দত্তবাবু কই? আচ্ছা মুস্কিল। এখনও এসে পৌঁছোননি? বড়বাবুর সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট হারাধন দত্ত। তারই জিম্মায় ষ্টাফের ফাইলগুলো থাকে। থেকে থেকে আজই তিনি লেট্। আশ্চর্য ব্যাপার! বলে বলে পারা যায়না এঁদের। আরে বাবা, এটা অফিস, শ্বশুরবাড়ী নয়।

বড়বাবু অস্থির হয়ে উঠলেন।

এমনসময় ছাতা বগলে ঢুকলেন দত্তবাবু।

—দশটা বারো! ঘড়ির দিকে চেয়ে সময়টা বলে দিলেন বড়বাবু। মানে, বুঝিয়ে দিলেন দত্তবাবুকে—আপনি আজ বারো মিনিট লেট্।

দশটা পনরো পর্যন্ত হাজ্‌রি-খাতা বড়বাবুর টেবিলে থাকে। মিনিটের কাঁটা পনরোয় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে খাতা চলে যায় সেক্রেটারীর ঘরে। দত্তবাবু আগেই এসেছিলেন। কিন্তু নিচে কি একটা ব্যাপার ঘটেছে দেখে আটকে পড়েছিলেন। ডেস্‌প্যাচ সেক্‌সনের বাবুরা আর পিওনরা রূপলালকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। রীতিমত উত্তেজিত পরিস্থিতি। থর্‌থর্ করে কাঁপছে লোলচর্ম রূপলাল।

—নিন্, তাড়াতাড়ি রূপলালের ফাইলটা বার করে দিন।

—রূপলালের ফাইল?

—হ্যাঁ, বড়সাহেব চাইছেন।

সব্বনাশ! এরই মধ্যে এন্দুর গড়িয়েছে ব্যাপারটা?

—ওর ফাইল কেন চাইছেন জানেন নাকি স্যার?

—তা কি করে জানবো। চাইলেন, বার করে দিন, ব্যাস্।

—দিচ্ছি। নিচে কি সব গণ্ডগোল হয়েছে শুনছিলাম স্যার। বড়সাহেবের সঙ্গে রূপলালের একচোট্...

কথা শেষ হলোনা। একেবারে চোখ কপালে তুলে বড়বাবু বললেন, সে কি?

হ্যাঁ, সার। প্রায় হাতাহাতি। বলে, দত্তবাবু ফাইল বার করে দিলেন। বড়বাবু সেটা সাহেবের টেবিলে দিয়ে সোজা নেমে এলেন ডেস্‌প্যাচ্ সেক্‌সনে।

—কি হয়েছে? সব ভিড় করে কেন?

বড়বাবুকে দেখে সরে গেল সবাই। রইলো শুধু রূপলাল ও হেড ডেস্‌প্যাচার। রূপলাল তখনও উত্তেজিত। রাগে কাঁপছে।

—হাম্ আওর কাম্ নেহি করেগা বড়াবাবু। হামকো ডিস্‌মিস্ কর্ দিজিয়ে।

রূপলাল বলতে চায়, আমায় রেহাই দিন। রিটায়ার করিয়ে দিন।

—কি হয়েছে কি?

হেড্ ডেস্‌প্যাচার বিশু বাগ্‌চী এবার কথা কইলেন।

—সাহেব কম্পাউণ্ডে ঢুকেই এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ রূপলালকে ধম্‌কাতে লাগলেন। তুমি কিস্‌সু করোনা, ফাঁকিবাজ কোথাকার! চারিদিক নোংরা করে রাখো। তোমায় জরিমানা করবো। এই কথা শুনেই হঠাৎ যেন রূপলালের কি হলো স্যার। রক্ত চড়ে গেল মাথায়। হাতের ঝাড়ুটা মাটিতে আছড়ে সাহেবের মুখের উপর বলে দিলো—আমি পারবো না।

সর্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর কথা! ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো বড়বাবুর হাত-পা। কি দুঃসাহস! যুগটা কি হলো! নিশ্চয় পিছন থেকে ওকে উস্‌কোচ্ছে কেউ। ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন করেছে নাকি এরা?

—তোমার কি মাথা খারাপ হলো, রূপলাল?

রূপলাল অবাক। এরা সবাই দেখছি একজাতের লোক। বুড়োর দুঃখকষ্ট বোঝে না। গত দুটো বছর সে বারবার বলে আসছে :—এতো কাজ একটা জোয়ান ঝড়ুদারও পারবে না। একটা উপায় করুন। সে-কথা কানে নেবে না এরা। উল্টে ওর ওপরই চাপ? মাথা খারাপ?

দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর হলো এই অফিসে কাজ করছে রূপলাল। পনরো বছরের একটি

উত্তরকিশোর সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়েছিল চুয়াল্লিশ বছর আগে। একটা হলঘর, একটা ল্যাভাটরী আর সামনে-পিছনে খোলা জমি; এইটুকু ঝাড় দেওয়া, মোছা, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখা ছিল তার কাজ। পনরোটাকা মাইনে। প্রচুর—প্রচুর ছিল ঐ পনরোটা মুদ্রা তার পক্ষে। সেদিনের সেই অফিস বেড়ে ফেঁপে কি বিরাট হয়ে গেল। ছিল একটা কেরানিবাবু, সে, একটা পিওন, একটা টাইপ মেশিন; আর আজ? একতলার মেইন বিল্‌ডিং দোতলা হলো। তাতেও কুলোলোনা। আবার একটা নতুন বিলডিং হলো তিনতলা, পুরোনোর গা-লাগা। মাইনে যতো না বাড়লো, তার পাঁচগুণ বেশী কাজ চেপে গেল কুঁজো দেহটার ওপর। একটার জায়গায় পঁয়ষট্টিটা বাবু। পাঁচটা ল্যাভাটরী। এতো খরচ হয় অথচ আর একটা ঝাড়ুদার হয় না? উল্টে সমালোচনা? ফাঁকিবাজ দুর্নাম? এতোগুলো লোকের পায়ের ধুলো আর কুচোনো কাগজ জড় করে করে কুব্জ ক্লান্ত হয়ে গেল বেচারা। এর ওপর জরিমানার জুজু?—মাথা খারাপ ক্যা বোলতা আপ্ বড়াবাবু? তোত্‌লার মত কথাগুলো বললো রূপলাল। নেহাৎ সমীহ করে তাই এটুকু বলেই থেমে গেল সে।

—জানো, সাহেব এসেই তোমার ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছে?

—হুঁ! ফাইল! উধার ভগবান ভি সব্ লিখ্‌তা হ্যায় ফাইলমে, হাঁ....

একেবারে 'ফুঃ' করে উড়িয়ে দিতে চাইলো রূপলাল বিষয়টার গুরুত্ব। উপরে ভগবান আছেন, ফাইল নিয়ে কি করবে?

বড়বাবু আর কথা বললেন না। সকলকে ভিড় করতে মানা করে ফিরে গেলেন ওপরে।

দুই

একদিন গেল, দুদিন গেল। এমনি করে সাতদিন।

সারা অফিস যেন দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে—কি হয়, কি হয়!

কিন্তু, কই! রূপলালের ফাইলটা খোলাও হয়নি, তেমনি পড়ে আছে টেবিলে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আবার ডান থেকে বাঁয়ে। বড়বাবু আড়চোখে লক্ষ্য করছেন শুধু।

ওদিকে রূপলাল অনড়। রিজাইন সে করবেই। কোত্থেকে একটা চিঠি টাইপ করিয়ে এনেছে। পুরোনো সহকর্মীরা রাশ টেনে আছে। পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরী অশ্বিন দাসের। তেত্রিশ, শীতলপ্রসাদের। অশ্বিন রীতিমত ধম্‌কাচ্ছে রূপলালকে, আর শীতল ভালো কথায় বোঝাচ্ছে।—ভেবে দ্যাখ। ছেলেটা বড় হয়েছে। রাগারাগি না করে ছেলেকে তোর জায়গায় বসিয়ে তবে রিটায়ার কর্।

ঠিক কথা, সৎ পরামর্শ। কিন্তু রূপলাল বলে, ইজ্জতের দিকটা? এদ্দিন যে চাকরী করলে তার একটা ইজ্জৎ নেই?

—ধুত্তোর ইজ্জৎ! বলে, অশ্বিন দাস কেড়ে নেয় টাইপ করা চিঠি। রেজিগ্‌নেশন পত্র দেওয়া আর হয় না। সিদ্ধান্ত অনড় থাকে অবশ্য।

—সরকার!

বিশ দিন পর অকস্মাৎ বড়বাবুকে ডেকে সেক্রেটারী নিতান্ত লঘুভাবে বললেন—রূপলালের চাকুরীর ফুল পার্টিকুলার্স আজই ছকে দাও। কবে জয়েন করেছিলো, কতদিন

ছুটি নিয়েছে, মাইনে, সব কিছু।

ছ্যাঁৎ করে উঠলো শক্তিপদ সরকারের বুক। এইবার তাহলে হাত পড়লো রূপলালের ঘাড়ে। কি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেওয়ার ধরণ। বিশ দিনেও রাগ পড়েনি? কেমন লঘু তরলসুরে অর্ডার দেওয়া! যেন কিছুই হয়নি।

হারাধন দত্ত কেশ্‌টো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন। রুলটানা কাগজে ঘর কেটে কেটে তৈরী করতে লাগলেন চার্ট। অফিসময় সুরু হলো মৃদুগুঞ্জন। গেল এবার রূপলাল। ডাইরেক্‌টার্সদের আগামী মিটিং-এ জবাই। নির্ঘাৎ।

সত্যি সত্যি রূপলালের বিষয়টা ডাইরেক্‌টারদের মিটিং-এর আলোচ্য বিষয় হয়ে দেখা দিল। কুড়ি দিন পর মিটিং। খবরটা শোনামাত্র হাতের ঝাড়ু ফেলে দিয়ে রূপলাল গ্যাট মেরে, বসলো। বললে—কাম্‌ নেহি করেগা! এর 'বদ্‌লা' নোবো আমি।

—এটা কি ভালো হচ্ছে, রূপলাল? বোঝবার চেষ্টা করলেন বড়বাবু।—গ্র্যাচুয়িটি পেতে কষ্ট হবে যে!

—ছুক্‌ কেটে দিয়েছেন ত সব পেশ করে সাহেবের কাছে। দেখুন না, চুয়াল্লিশ বছরের চাকরীতে কতো মেডিক্যাল লীভ হয়। বেমারির সার্টিফিকিট্‌ এনে দেবো আমি! নির্ভয় উত্তর রূপলালের।

পরদিনই এনে দিলো রূপলাল একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট। একেবারে পাকা-পোক্ত কাজ। কাজ সে করবে না, যতক্ষণ না সুবিচার হচ্ছে। শপথ তার, সে প্রতিশোধ নেবে।

ডিরেক্‌টারদের আগামী মিটিংটার গুরুত্ব অনেক। সারা অফিস হাঁ করে অপেক্ষা করছে ঐদিনটার। রূপলালের কেশ্‌টাও আলোচনা হবে। ভদ্রলোকের কন্‌ট্রাক্ট পাঁচ বছরের। পূর্ণ হতে চলেছে সেটা। উনি দরখাস্ত করেছেন মেয়াদবৃদ্ধির। কে জানে কি হয়! অফিসের সবাই ত বাঁচে লোকটা গেলে। অতিষ্ট হয়ে গেছে ওর অত্যাচারে।

এদিকে কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে রূপলাল কেমন যেন হয়ে গেল। একদিন, দুদিন, তিনদিন— কিন্তু ছাঁকড়া গাড়ীর ঘোড়ার কি বসে থাকা সাজে?— দশদিনের মাথায় একেবারে বিছানা নিলো রূপলাল। ডাক্তারের সার্টিফিকেটের সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্বেই বোধহয়, মিটিং-এর সাতদিন আগে বুড়ো রূপলালকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হলো। অসুখ, ইউরেমিয়া।

যথাসময়ে মিটিং বসলো ডিরেক্‌টারদের। আশ্চর্য্য সহানুভূতির সঙ্গে ওঁরা বিবেচনা করলেন রূপলালের কেশ্‌। সেক্রেটারীকে এই নিয়ে যে কোনঠাসা করতেও কসুর করেননি তাঁরা, এ-খবর অফিসে ছড়িয়ে দিলো অগ্নি। নিরক্ষর হলে কি হবে, আশ্চর্য ক্ষুরধার বুদ্ধি অগ্নির। ইংরাজীতে যা আলোচনা হয়েছিল সব এসে বলে দিলো অফিসের সকলকে। আনন্দে লাফিয়ে সব এসে বলে দিলো অফিসের সকলকে। আনন্দে লাফিয়ে উঠলো সবাই। বললে,—একটা উড়ো চিঠিতেই কিস্তি মাৎ। ভগবান আছেন। মুখের মত জবাব হয়েছে। রূপলালের চাকরী ত থাক-লোই, আর একজন সহকারীও পেলো সে। শুধু তাই নয়, ঐ সহকারী পদের জন্য রূপলালের আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে তার কথা যেন সর্বাগ্রে বিচার করা হয়, স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছেন ডিরেক্‌টার্স। আর, সেক্রেটারীর আবেদন মঞ্জুর করতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। প্রভুরামের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে অবশ্য থোক্‌ বিশহাজার টাকা বখ্‌শিস দিয়েছেন। থাকে

বলে, 'এক্স-গ্র্যামিয়া পেমেন্ট'!

তবু, আগরওয়াল একেবারে নিভে গেলেন! ছোট ছেলেটা বিলেতে রয়েছে। কোর্স শেষ হতে আর মাত্র এক বছর। এইজন্যই দরকার ছিলো এই মেয়াদবৃদ্ধির। প্রভিডেন্ট ফন্ড বাবদ বার হাজার, বখ্‌শিস বিশ হাজার—দুটো মিলিয়ে বত্রিশ হাজার পাচ্ছেন প্রভুরাম। তবু—আর এক বছরের চাকরী হলে ভালো হত। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়েছে রূপলালের কথা। সে যেন সর্বক্ষণ ওঁর দিকে চেয়ে ফিক্‌ফিক করে হাসছে। একটা মেথরের যে-ভাবে জয় জয়কার হয়ে গেল তারপর এ-অফিসে চাকরী না করাই ভালো। রাগে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে তাঁর।

আফিসে আসতে পা সরছিলো না। কম্পাউন্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো প্রভুরামের, বুড়ো রূপলাল সেদিনের ঘটনার প্রতিশোধ নেবে বলে এবার যেন তার হাতের ঝাড়ুটা আরও জোরে মাটিতে আছড়ে খিলখিল করে হাসছে। প্রভুরামের পদক্ষেপেও আর সেই ধরাকে-সরা-জ্ঞান নেই। পা টিপে টিপে ঢুকলেন যেন অফিসে।

—সরকার!

শক্তিপদ সরকারও চম্‌কে উঠলেন এই সম্বোধনে।

গত পাঁচ বছরে একদিনের জন্যও এমন নির্জীব ডাক শোনেননি

ব্যাপার কি? হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন সাহেবের ঘরে।

—সরকার! আমি আর মাত্র পনরো দিন অফিসে আসবো। তারপর, লীভ প্রিপেয়ারেটারী টু রিটায়রমেন্ট।

—হোয়াট্‌ স্যার? শক্তিপদ সরকার যেন একটা সতরোতলার আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীকে ভূমিকম্পে ধ্বসে যেতে দেখলেন চোখের সামনে।

—আপনি গেলে কি হবে স্যার এই অফিসের? দাসত্বের সেই আদিম ও অভ্যস্ত চাটুকারিতা শক্তিপদ সরকারের কথায়। প্রভুরাম আজ অন্য লোক; কথাগুলো মোটেই ভালো লাগলো না তাঁর।

—নেহাৎ জরুরী ব্যাপার না থাকলে তোমরা আমাকে আর ডিসটার্ব কোরো না। রাঘবন্‌ সাহেবের সাহায্য নিও।

—অল্‌রাইট স্যার। বলে, বেরিয়ে এলেন শক্তিপদ।

পাঁচবছরের একছত্র দাপট কলমের এক খোঁচায় শেষ। অকারণ নিজের ঘরে পায়চারি করেন প্রভুরাম আগরওয়াল আর ভাবেন ঃ এই টেবিল-চেয়ার-টেলিফোন, দোয়াত-কলম, এতগুলো কর্মচারী, এদের আমি কেউ নই! এরা সবাই বোধহয় আজ মহাখুসী, আমি চললাম!

—স্যার! আপনাকে একটা ফেয়ারওয়েল দোবো ঠিক করেছি আমরা। বিকেলের দিকে মুখ কাচুমাচু করে নিবেদন করলেন বড়বাবু।

ফেয়ারওয়েল? শব্দটা হাতুড়ির মত বুকে গিয়ে আঘাতে করলো প্রভুরামের। পাঁজরার নিচের কি একটা জিনিষ যেন থেতলে রক্তাক্ত হয়ে গেল সেই ঘা খেয়ে।

—নো, নো সরকার। লেট্‌ মি কুইট্‌ কোয়াএট্‌লি!

—তা কেমন করে হয় স্যার! সবিনয়ে প্রতিবাদ করেলন বড়বাবু।—স্টাফ্‌ চাইছে, আপনি অমত করবেন না স্যার!

প্রভুরাম আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে। স্টাফ্‌ চাইছে। আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। কেমন এক আচ্ছন্ন মৌনসম্মতি প্রকাশ পেলো তাঁর চোখেমুখে।

তিন

রূপলালের অবস্থা খুব খারাপ। ছলছল চোখে ছেলেটা এসে খবর দিয়ে গেল অফিসে। কাল থেকে জ্ঞান নেই। ডাক্তার বলছে ঃ আর কয়েক ঘন্টা!

এদিকে ফেয়ারওয়েল আজকে। বেলা তিনটেয়। অফিসের সকলে চাঁদা দিয়েছে। মালার অর্ডার নিউ মার্কেটে, নামকরা দোকানে সন্দেশ। এছাড়া আরও পাঁচরকমের মিষ্টি এখানে-ওখানে। বড়বাবু আর হারাধন দত্ত বিশেষ ব্যস্ত। সব জিনিষ সময়ে আনিয়ে রাখতে হবে। সকলের বসবার মতো হলঘরে চেয়ার সাজানো একটা বড় কাজ। প্রেস থেকে যে 'অভিনন্দন' ছাপা ও বাঁধাই হয়ে আসার কথা সেটা এখনও আসেনি। ফটোগ্রাফারকে আবার ফোন করতে হবে। নানাঝঞ্ঝাট।

রূপলালের ছেলে সন্তলাল তখনও ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে। বড় সাহেব কি একটা কাজে এদিকে এসে থামলেন।

—রূপলাল ক্যায়সা হ্যায়?

ছেলেটা কেঁদে ফেললো। অম্বি দাস জবাব দিল—আচ্ছা নেই হুজুর। ও আর নহি বাঁচেগা।

প্রভুরাম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। সেকি? বাঁচবে না? বাঁচবে না রূপলাল?

—সন্তলাল কিছু টাকা আগাম চাইছে হুজুর।

হাসপাতালে বাকি আছে ওষুধের দরুণ। নিবেদন করলো অম্বি।

—এ্যাকাউন্টেন্ট!

সেক্রেটারীর ডাকে ছুটে এলেন এ্যাকাউন্টেন্টবাবু।

—ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে দাও। এখুনি।

অর্ডার দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন প্রভুরাম। রূপলাল বাঁচবে না! ওকি তবে আমারই ফেয়ারওয়েলের দিনে চিরকালের ফেয়ারওয়েল নিয়ে চলে যাবে? আশ্চর্য শত্রুতা রূপলালের। এমনভাবে আমাকে বারবার আক্রমণ করছে কেন ও? মনে মনে 'শত্রুতা' শব্দটাই উচ্চারণ করলেন প্রভুরাম। তবু শত্রুভাব জাগলোনা। এক বিচিত্র বৈরাগ্যে চোখের পাতা ভিজে গেল। ফেয়ারওয়েল!

প্রভুরামের ইচ্ছে করছে, ফেয়ারওয়েল পার্টি বন্ধ করে দেন। বড় লজ্জা করছে তাঁর। কিন্তু তা সম্ভব নয়, টিক্‌টিক্, টিক্‌টিক্—মাথার ওপর ঘড়িটা বলছে, আর সম্ভব নয়। এখন বেলা সওয়া একটা। মালা, মিষ্টি সব এসে গেছে।

পঁচিশ টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিলো সন্তলাল। কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। দর দর করে চোখের জল গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে।

—পিতাজী মর্‌ গিয়া!

চেয়ার-টেবিল সাজানো হচ্ছিল ফেয়ারওয়েলের জন্য। বড়বাবুকে ডেকে খবরটা দিলো অম্বি দাস।

—ইস্! শেষ পর্যন্ত মরেই গেল? জিদ বজায় রাখলে বটে, আর ঝাড়ুতে হাত দিল না।

—বড় সাহেবকে খবরটা দেবো?

—না, না, অম্বি। এখন থাক্। পরে জানতেই পারবে। বাধা দিয়ে উঠলেন বড়বাবু।

—কিন্তু না জানিয়ে ত উপায়ও নেই, বড়বাবু! সন্তলাল জিগ্যেস করছে, রূপলালের লাস

হাসপাতাল থেকে এখানে আনতে পারে কিনা। পূজোপাঠ ও আর সব 'ক্রিয়াকরম' এইখানে সেরে তারপর ওরা মড়া নিয়ে যাবে।

অফিস-সংলগ্ন ষ্টাফ-কোয়ার্টারে রূপলাল দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর বাস করেছে। জীবনে যেমন, মরণেও তেমনি সমান অধিকার আছে তার। নিশ্চয় আসবে সে এখানে। কিন্তু, বড়সাহেবের ফেয়ারওয়েলের সময় রূপলালের মৃতদেহ এনে ফেলা অশুভ মনে হবে না ত? সমস্যায় পড়লেন বড়বাবু।। কি করা যায়? এটা কি ঠিক হবে? শেষ পর্যন্ত সহকারী সেক্রেটারী মিঃ রাঘবনের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করে অনুমতি দিলেন। সন্তলাল চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

টিক্‌টিক্....টিক্‌টিক্....।

ঘড়ির কাঁটা আড়াইটে পেরিয়ে গেল। টক্‌টকে বড় গোলাপের আর লালপদ্মের মালা এসে গেছে। পিওনরা প্লেট সাজাচ্ছে। ফুটন্ত জলে লপ্‌চু চায়ের পাতা ভিজছে। গন্ধ ছড়িয়েছে তার। চেয়ার টেবিল সাজানো। নিজের ঘরে ক্রমাগত পায়চারি করছেন প্রভুরাম। অফিসে আজ তাঁর শেষ দিন। এই চেয়ার-টেবিল, অর্থ-প্রভুত্ব, সব ফেলে চলে যেতে হবে! শুধু এই অফিস কেন? রূপলাল যেন আরও কিছু বলতে চাইছে। আরও বড় একটা ফেয়ারওয়েলের কথা!

—স্যার! উই আর রেডি। ছোটসাহেবকে খবরটা দেওয়া হলো। ছোটসাহেব আবার সেই খবর বড়কে দিয়ে তাঁকে আহ্বান জানালেন অনুষ্ঠানে।

—রেডি? সর্বাঙ্গে আশ্চর্য তৎপরতা ফুটিয়ে প্রভুরাম আগরওয়াল উঠে পড়লেন। হুক থেকে খদ্দরের টুপিটা নামিয়ে মাথায় পরলেন। তারপর পা বাড়ালেন হলঘরের দিকে। বুকের ভেতরটা বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে। ঘরের মেঝে, কাঠের পার্টিশান, চারদেওয়ালের ছবি, সকলে যেন প্রভুরামের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে। হাসছে রূপলালের চুয়াল্লিশ বছরের সম্পর্কটাও।

কর্তারা এসে পৌঁছতেই সমবেত কর্মচারীরা উঠে দাঁড়ালেন একবার।

ফুল-কাটা টেবিল-ক্লথ আর ফুলদানি-দিয়ে সাজানো ছোট টেবিলের কাছে বসলেন সেক্রেটারী প্রভুরাম ও তাঁর সহকারী রাঘবন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন রাঘবন্। অফিসের সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী দুলাল ব্রহ্ম মাল্যভূষিত করলেন প্রভুরামকে। ছাপানো অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করতে লাগলেন বড়বাবু। ইতিমধ্যে পিওনেরা হাতে-হাতে এগিয়ে দিতে লাগলো মিষ্টান্নের প্লেট। বড়বাবু পাঠ-শেষে বাঁধানো অভিনন্দন-পত্রটি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন সেক্রেটারীর হাতে, এমন সময় ঝম্‌ঝম্ শব্দে বাজনা বেজে উঠলো। ব্যাগপাইপ, ঝাল্লা, সানাই ও আরও কি সব বাদ্যযন্ত্রের সুসংবদ্ধ তাল। বাদ্যের ঝঙ্কার ছেয়ে ফেললো চারিদিক।

—তোমরা কি বাজনারও বন্দোবস্ত করেছো? জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রভুরাম।

—না ত স্যার।

—তাহলে কিসের বাজনা কম্পাউন্ডে?

তাইতো? কিসের বাজনা? বড়বাবু আর রাঘবন তাকালেন অম্বি দাসের দিকে।।

অম্বি ছুটে গিয়ে দেখে এলো।

রূপলালের লাস আনছে হুজুর! খবর দিল অম্বি।

ওরা বাজনা বাজিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যায় সৎকারের জন্য।

—হোয়াট্? রূপলাল ইজ্ ডেড্?

প্রভুরাম সংবাদটা শোনামাত্র তড়িতাহতের মত কাঠ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। রূপলাল! মরে গেল রূপলাল! ড্যাংড্যাং করে বাজনা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে রূপলাল? কেন আসছে? যাবার আগে তার শেষ বিদ্রূপ করে যাচ্ছে নাকি? না, এই তার প্রতিশোধ? তা হোক্....

সদ্য-উপহার-পাওয়া মালাটার দিকে একবার তাকালেন প্রভুরাম। ভাবলেন, এদের হয়ে আমি আবার দেবো নাকি এই মালা রূপলালের গলায় পরিয়ে? কাঁপতে কাঁপতে হাতটা থেমে গেল মালার কাছাকাছি এসে। না, না— এ-মালা নয়, বাধা দিল প্রভুরামের বিবেক। অনেক কুণ্ঠা জড়ানো আছে এ-মালায়। প্রভুরাম যে সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের এই দান! ভেবেছেন, এরা রূপলালের প্রতিনিধি হয়ে প্রতিশোধের মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছে ওঁকে।

—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড্স্!

হঠাৎ অশ্রুসজলনেত্রে ভাবাচ্ছন্ন প্রভুরাম উঠে দাঁড়ালেন, টেবিলের উপর দুহাত রেখে। বাইরে তখনও বাজনা বাজছে গম্‌গম্ করে। ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ সানাই আর করোনেটের সঙ্গে তালে-তালে ঝঙ্কার তুলছে ঝালা। চুয়াল্লিশ বছরের জড়-করা ধুলো আর জঞ্জাল পৃথিবীর ডাস্টবিনে জমা দিয়ে মৃত্যুর পথ ধরে তালে তালে মার্চ করে চলে যাচ্ছে রূপলাল আর এক প্রভুরামের দপ্তরে।

—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস্!

গলা খাঁকারি দিয়ে আর একবার চেষ্টা করলেন তাঁর ভাষণ সুরু করার। চাপা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। প্রভুরাম বলতে চাইছিলেন, রূপলাল আমায় একটা লেশন্ দিয়ে গেলো। সে ভাববার সুযোগ দিয়ে গেল, কোন্ ফেয়ারওয়েলটা কাম্য। আমি হেরে গেলাম! ইয়েট্ আই এম্ হ্যাপি। তোমরাও হেরে গেলে, বন্ধুগণ! তোমরা যা পারোনি, রূপলাল তা পেরেছে। দেখো দেখি, কেমন গম্‌গমে বাজনার আয়োজন করেছে সে আমার ফেয়ারওয়েলের জন্য!

ফ্রেন্ড্স্!

থেমে থেমে কান্না চেপে বললেন প্রভুরাম—রূপলালের শ্রাদ্ধকৃত্যের জন্য আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে যাবো তোমাদের হাতে। তোমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে দেখো যেন সব কাজ সুসম্পন্ন হয়....!

বাইরের বাজনাকে ছাপিয়ে এবার হলঘর মুখর হয়ে উঠলো মুগ্ধ বিস্মিত কর্মচারীদের স্বতোৎসারিত করতালিতে। সত্যি অবাক হয়ে গেছে তারা প্রভুরামের পরিবর্তন দেখে।

—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড্স্!

বিচিত্র কান্নামাখা হাসিমুখে যেন আরও কিছু বলবেন বলে আবার উঠে দাঁড়ালেন প্রভুরাম।

সহৃদয় হৃদয়

সুশীল রায়

স্টুডিয়োর গাড়ি বিদায় করে দিয়ে পার্বতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

পার্বতীর মনের মধ্যে ভীষণ-একটা আলোড়নের সৃষ্টি যে হয়েছে, হেমাঙ্গিনী কয়েক দিন থেকেই তা বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে বলেই হেমাঙ্গিনী পার্বতীকে আর বেশি কথার মধ্যে টানছে না।

হেমাঙ্গিনী উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে—পার্বতী যেন বড় ক্লান্ত, পা যেন তার চলছে না, যেন অনেক কষ্টে সে নিজেকে টেনে তুলছে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

উপরে এসে দাঁড়িয়ে পার্বতী একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আঃ।"

ব্যস্ত হয়ে উঠল হেমাঙ্গিনী, পার্বতীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল? শরীর খারাপ ঠেকছে নাকি, দিদিমণি?"

"না, আরাম।" পার্বতী ক্লান্ত গলায় জবাব দিল, "বড় আরাম পাচ্ছি, হেম। জবাব দিয়ে এলাম। ফিরিয়ে দিলাম গাড়ি। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি—আমি অভিনয় আর করব না।"

"তার মানে?"

"অভিনেত্রী-জীবন আজ থেকে সাঙ্গ হয়ে গেল।"

আঁৎকে উঠার মত করে হেমাঙ্গিনী বলল, "খতম? নিজেকে খতম করে দিলে? এত নাম-ডাক, এত হৈ হৈ, এত জল্পনাকল্পনা তোমাকে নিয়ে। এক ফুঁয়ে একসঙ্গে সব—"

হেমাঙ্গিনীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পার্বতী বলল, "সব ভুয়ো। সব মেকি। ওসব নামডাকের মানে আছে নাকি?"

"কিন্তু টাকা-পয়সা? তার তো দাম আছে?"

"আছে। অনেক জমিয়ে ফেলেছি, হেম, অনেক। একটা জীবন কাটাবার মত জমে গেছে টাকা। একটা মানুষের লাগেই বা কত?"

আজগুবি গল্পের মত মনে হচ্ছে এ-ঘটনা, যেন একটা অলৌকিক কান্ড। দেশের মানুষ যার নাম শুনলে পাগল, যাকে এক মিনিটের জন্যে চাক্ষুষ দেখার জন্যে উন্মাদ, ছবি-মহলে যার জুড়ি খুঁজে পাওয়া দায়, সেই চিত্রনটী চট করে ছায়াছবির পর্দা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে এত সহজে? বিশ্বাস হয় না হেমাঙ্গিনীর।

"আমারই কি বিশ্বাস হয়, হেম? আমিই কি কখনো ভেবেছি যে একদিন আচমকা এই ভাবে আমাকে ছুটি নিয়ে নিতে হবে?"

ঘরে এসে মোড়ায় বসল পার্বতী। কিন্তু বসতে যেন ভালো লাগল না তার। বিছানায় গিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

এতবড় একজন চিত্রনটী, কিন্তু তার জাঁক নেই এতটুকু। হেমাঙ্গিনীর চোখে যেন এ-দৃশ্য আজ নতুন পড়ল। ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল সে। দেয়ালের এক কোণে তার বাবা আর মায়ের ছবি, আর একটা দুটো তার নিজের। আসবাব বলতে ঘরে বিশেষ কিছু নেই। একটা হাল্কা পালঙ্ক, একটা ড্রেসিং টেবিল, আর খান দুয়েক সোফা।

হেমাঙ্গিনী বলল, "একটু খেয়ে নাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর।"

একটু থেমে বলল, "ভাবছিলাম অন্য কথা। তোমাকে-না ওরা বেকায়দায় ফেলে।"

হেমের কথা শুনে পার্বতী উঠে বসল, বলল, "কি?"

"যে ছবিটা আদ্দেকের বেশি উঠে গেছে, সেটা শেষ করার জন্যে চাপ দেবে নিশ্চয়। সহজে কি ছাড়বে ওরা? শর্ত তো একটা আছে?"

"আছে। কিন্তু আমি চুক্তিভঙ্গ করব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা আর ভাঙ্গতে পারব না। অনেক কষ্টে মন মজবুত করেছি। একটু আলগা দিলেই মন কাবু হয়ে যাবে। অভিনয় যে কত বড় নেশা, যারা অভিনয় করে তারাই জানে। এ-নেশা ছাড়া কঠিন। কিন্তু আমি ছেড়েছি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাকিটা শেষ করতে গেলেই আবার ফাঁদে পা দিতে হবে। ওরা যা পারে করুক। আমি যা ঠিক করেছি তা পাকা।"

হেম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এমন ধনুক-ভাঙা পণ করার হেতুই-বা কি? হেরম্বের বাঁদরামো নিশ্চয়।"

"হাঁ। কিন্তু হেরম্ব একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এ-লাইনে আমি যাদের দেখলাম তারা সকলেই এক-একটা হেরম্ব। ওদের কিছু বলিনে, কিন্তু নিজের উপরেই কেমন ঘৃণা এসে গিয়েছে। অভিনেত্রী জীবন মানে যে এই, তা যদি আগে জানতাম—"

"তবে বুঝি আসতে না?"

"বোধ হয় না। এটাও তো একটা জীবিকা। সব জায়গাতেই পুরুষ থাকবে, মেয়েরা কি তাহলে নিজের জীবিকার জন্যে কোথাও যেতে পারবে না? গেলেই ভুঙ্গেরা আসবে ভাঁড়ামি করতে?"

হেসে ফেলল হেম, বলল, "তোমার ভাষা শুনেই বুঝতে পারছি তুমি ভীষণ রেগে গেছ।"

পার্বতীর সঙ্গে হেমাঙ্গিনী কথা বলছে, কিন্তু তার মন চিন্তা করছে অন্য কথা। ভাবছে, মেয়েটা বুঝি আত্মহত্যাই করল। আত্মহত্যার শামিলই তো তার এই কাজ। খ্যাতিতে-প্রতিপত্তিতে সে যখন সকলের মাথার উপরে, এমন কি মনক্কার মত চটুল নায়িকার খ্যাতিকে যখন তার খ্যাতি ছাপিয়ে গেছে, সেই সময় সে পর্দার গা থেকে নিজের ছায়া সরিয়ে নিল? হেম মনে-মনে তাই ভাবছে—এ তো মেয়ে মেয়ে নয়!

"ফিরে যাব।"

হেম জিজ্ঞাসা করল, "এবার তবে কী করবে?"

"তার মানে পুনর্মূষিক হবে?"

আপত্তি করে উঠল পার্বতী, বলল, "তা কেন? পুনর্সিংহ হব। সিংহই ছিলাম, মাঝে ছায়াছবিতে ছায়ানটীগিরি করতে এসে মনটা ছোট হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে মূষিক-মূষিক বোধ করেছি; এবার ফিরে যাব, ফিরে গিয়ে আবার সেই সিংহই হব, হেম।"

হেম কান পেতে শুনল সবটা, বলল, "বাবা। তাজ্জব।"

আর কোনো কথা বলল না হেমাঙ্গিনী। ধীরে ধীরে সে চলে গেল তার নিজের এলাকায়—রান্নামহলে।

এ ঘরে একা পড়ে রইল পার্বতী। সবই কেমন বিচিত্র মনে হতে লাগল তার। যেন, নদীর এক পার ভেঙে আর এক পার গড়া হচ্ছে। কোন এক অখ্যাত পল্লীর ঘৃণা জীবনের এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা মনক্কা মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে বিয়ে করে সমাজের ধাপে উঠে গেল, হয়তো রুমে সে আরো উঠবে; আর, সমাজের শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে তাকে ডেকে নিয়ে এল হরলাল

জোয়ারদার, নিরীহ বিশ্বাসে সে সাড়া দিল সেই ডাকে, আজ হেরম্ব পুরস্কারস্থর দল তাকে টেনে নীচে নামিয়ে মনক্কার মত করে তোলার জন্যে দল বেধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করছে। তাদের চক্রান্তের মধ্যে নেই পার্বতী। সরে পড়াই মঙ্গল। মন যদি একদিন হঠাৎ লোভী হয়ে ওঠে তাহলে মনকে আর বাগ মানানো যাবে না।

অতএব, আর কি! এখন আর সে পার্বতী নয়। এখন সে মৌদনীপুর জেলার মল্লিকপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির সেই মেয়ে হিরন্ময়ী। সে এখন আবার তার পুরাতন নিজস্ব নামে পরিচিত হতে চায়। পর্দার নাম পরিহার করতে চায় সে। স্বনামধন্য হতে চেয়েছিল—হয়েছে। কিন্তু, পার্বতী একটু চিন্তিত আর বিচলিত হয়েই যেন উঠল। মনে পড়ল তার নয়নতারার কথা। ও আবার একটু লোভী ধরনের একটু লঘু টাইপের। নিজেকে ও সামলাতে পারলে হয়। না-ই যদি পারে, সে দায় ওর। সে দায় তার স্বামীর। তাকে সে এ-লাইনে আসতে উৎসাহ দিয়েছে বলেই সব দায়িত্ব তার নয়।

হেমাঙ্গিনীর আশঙ্কা, এবং সম্ভবত পার্বতীরও আশঙ্কা, প্রায় মিথ্যে হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল, হেরম্বরা হয়তো ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে পড়বে। হয়তো পিড়াপিড়ি করবে। হয়তো চুক্তিভঙ্গের জন্যে নানা ভাবে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে।। কিন্তু দুই দিন কেটে গেল, কেউ আর এল না। তারা কেউ এল না দেখে পার্বতী যে খুব খুশি হল, এমন কথা বলা যায় না। পিড়া-পিড়ি করলেই যে সে তাদের অনুরোধ রক্ষা করত, এমন নয়। তবুও ওদের তরফের উদাসীনতায় পার্বতী একটু ক্ষুণ্ণই হল হয়তো। অলকাপুরী স্টুডিয়োর কর্তাব্যক্তিরা কেউ এল না বটে, কিন্তু এল তাদের চর। এল নয়নতারা, এবং—সঙ্গে এ কে?—

নয়নতারা বলল, "একে চিনলে দিদি?"

নয়নতারার প্রশ্নের ঢং দেখে, এবং সঙ্গের লোকটার চেহারা দেখেই সে বুঝল কে এ। বলল, "চিনেছি।"

স্টুডিয়োর দেখাকে দেখা বলা যায় না। সেখানে দেখার মধ্যে যেন আন্তরিকতার আঁচ নেই, যেন অভিনয়েরই একটা উত্তাপ আছে। নয়নতারা বলল, "ওরা সব মর্মাহত। তুমি ওদের দারুণ ঘা দিয়েছ দিদি।"

"তাই নাকি? কী বলে ওরা?"

ওরা কি বলে, সব কথা গুছিয়ে বলার সাধ্য নেই নয়নতারার। পালঙ্কের উপর দিদির পাশে বসে সে কথা বলতে লাগল। একটু দূরে মোড়ার মধ্যে বসে রইল তার স্বামী। মোড়ায় বসে বসে সে ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে চোখ বুলাতে লাগল। তার যেন কোনো কথাও নেই, কোনো কাজও নেই। পর্দার আড়াল থেকে হেমাঙ্গিনী একবার দেখে গেল এদের। কিন্তু এরা কারা সে চিনল না।

স্টুডিয়োর লোকরা প্রথমে নাকি ঠিক করেছিল, তারা তাদের নায়িকা পার্বতীকে এসে একটু চাপ দেবে। অন্তত ভোরের তারা ছবিটা শেষ করে দিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাবে। তাদের ধারণা হয়েছে. পার্বতীর অহংকার বেড়েছে; তাই পরে ঠিক করে, অনুরোধ করলে পার্বতীর পায়া আরো ভারি হয়ে উঠবে। তাই, চুপ করে থেকে কিছুদিন অপেক্ষা করবে। তবুও যদি পার্বতীর দিক থেকে কোনো গরজ না দেখে তাহলে অন্য ব্যবস্থার বিষয় তারা চিন্তা করবে।

আর, তাতে পার্বতীর অভিনেত্রী-জীবনেরই নাকি ক্ষতি—লোকে ধরে নেবে তাদের আশঙ্কাটা সত্যি।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করল, "কি সেই আশঙ্কা?" নয়নতারা একটু থেমে বলল, "নীরব বাঁণা! সে ছবিতে তোমার অভিনয় হয়েছে তো অপূর্ব। বোবা মেয়ের ভূমিকা এমন অদ্ভুত অভিনয় করেছ যে, সকলের ধারণা হয়েছে তুমি বুঝি সত্যিই বোবা হয়ে গেছ। এসব জান নিশ্চয়?"

"মানি। সত্যিই মানুষ কত বেকুব হতে পারে।"

নয়নতারা বলল, "মাইরি। যা বলেছ।" নয়নতারার কথা শুনে চমকে উঠল পার্বতী, বলল, "এসব ভাষা কোথায় শিখলি, নয়ন?" হেসে উঠল নয়নতারা, বলল, "জান না নিয়ম, যখন রোমে থাকবে তখন রোমানরা যা করে তাই করবে। এখন আমি স্টুডিয়োর জীব, স্টুডিয়োর ভাষা রপ্ত করতেই হবে।" নিঃশ্বাস ফেলল পার্বতী। বলল, "বেশ। কিন্তু ও-ভাষা তো মনক্কাদের, ওসব কি তোমার-আমার বলা সাজে?" এবার চমকে উঠল নয়নতারা, বলল, "বল কি। মনক্কা এখন সে-মনক্কা নেই। সে এখন কুলবধূ। তার চলা-বলা হাসা ভাষা সব এখন অন্যরকম। সে এখন আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে উঠে এসেছে; শেষে বুঝি আমাদের উপরেও টেক্কা দেবে।"

"ভালোই তো।"

নয়নতারা বলল, "তা হোক। তুমি চল দিদি। ও-সব অভিমান বাদ দাও। আমাকে এ-লাইনে নিয়ে এসে একা ফেলে পালিয়ো না।"

"উঁহুঁ। হয় না। অভিমান নয়। অপমান। আর ভালো লাগছে না। একটা সুযোগও তো জুটে গেছে। একটা বই আধখানা ক'রে হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি দেখে সকলের আশঙ্কাটা সত্যি বলেই প্রমাণ হবে। তারা ভাববে সত্যিই আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। বাঁচা যাবে।"

নয়নতারা বলল, "স্টুডিয়োতেও ঠিক এই কথা হয়েছে। তারা বলছে—এতে উচিত শিক্ষা নাকি পাবে তুমি। তোমাকে অভিনয় আর করতে হবে না। কেউ আর ডাকবে না তোমাকে।"

মনে-মনে হাসল পার্বতী। ডাকবে না! স্টুডিয়োর কর্তাদের আচরণে বোবা সে ব'নে গিয়েছে বটে, কিন্তু বোকা ব'নে যায় নি। আর, সত্যিই যে সে বোবা নয়, তা প্রচার করতে সেও পারে। অলকাপুরী স্টুডিয়োই বাংলাদেশের একমাত্র স্টুডিয়ো নয়। কিন্তু সে-কথা আলাদা। কেউ ডাকলেও সে আর যাবে না, এটা ঠিক। অলকাপুরী-স্টুডিয়োর ব্যবহারে সে ক্ষুণ্ণ; অন্য স্টুডিয়ো যে সেইজন্যে এক-একটা স্বর্গের টুকরো, এমন নয়। সব শৃগালেরই এক রা। পার্বতী বলল, "আমিও তাই চাই। আমাকে আর যেন অভিনয় করতে না হয়। কেউ যেন আমাকে আর না ডাকে।" নয়নতারা বলল, "মনের জোর বটে তোমার দিদি। নামের মোহও কি নেই তোমার?"

"ছিল। কিন্তু আর নেই। এ-লাইনটা একটু অদ্ভুত। যত নাম বাড়ে, সেই অনুপাতে মান কমে।"

কেমন অদ্ভুত যেন লাগল এই কথা। নয়নতারার যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না তার দিদির এই অভিমতটা। সে নতুন এসেছে এ-লাইনে, এখনো অনেক অভিলাষ আছে অনেক উচ্চাশা আছে তার। মানুষের মুখে মুখে ছড়াবে নাম, শহরের ঘরবাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে বিজ্ঞাপিত

হবে চেহারা—এতে সুখ কি কম; এতে যে রোমাঞ্চ তার তুলনা কোথায়? আজ সে ছোট ভূমিকার টুকিটাকি অভিনয় করছে বটে; কিন্তু নাম ক'রে নামভূমিকায় নামতে একদিন সে পারবেই—এতে সন্দেহ কি! একটা কথা এখনো এখানে বলেনি নয়নতারা, সেটা হচ্ছে—ভোরের আলো ছবিটার বাকি অংশ শেষ করার জন্যে স্টুডিয়ো-মহলের গোপন পরিকল্পনা। পার্বতী যদি একান্ত আর নাইই আসে, তাহলে তাদের নতুন তারা নয়নতারাকে দিয়ে সেই অংশটা অভিনয় করিয়ে নেওয়া। মুখের আদল দুজনের প্রায় এক, গল্পের মোড় দরকার মত একটু ঘুরিয়ে নিয়ে অগত্যা বইটা শেষ করে ফেলতে হবে। যে-ছবির, অর্ধেক কেন, তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ তোলা হয়ে গিয়েছে, একজন খামখেয়ালী অভিনেত্রীর একটা দায়িত্ববোধহীন খেয়ালের জন্যে সেই ছবি তো ইনকমপ্লিট রাখা যায় না।

নয়নতারা ভুরুতে অদ্ভুত বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে বলল, "শুনছ?"

স্বামী বেচারা কোনো কাজ না পেয়ে দেয়ালের দিকে চোখ দিয়ে বসে ছিল, এতক্ষণে সে যেন কিছু শুনল, বলল, "আমাকে বলছ?" খিলখিল ক'রে হেসে উঠল নয়নতারা, বলল, "না। তোমাকে না। দেয়ালকে।" মোড়া সমেত ঘুরে বসল বৈদ্যনাথ, বলল, "কি? কি ঠিক হল তোমাদের?"

উঁহুঁ। রাজি না। কিছুতে রাজি না দিদি।" বৈদ্যনাথ বুঝি এই সংবাদ শুনে একটু পুলকিতই হল, বলল, "তাহলে তোমার ঘাড়েই পড়ল।" পার্বতী যেন ধরতে পারল না কথাটা, উৎসুখ ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কিসের কথা বলছেন উনি?" নয়নতারা একটু ঢোক গিলল, বলল, "ঘাড়ের কথা। আমার ঘাড়ের কথা। আমার ঘাড় সত্যিই শক্ত, নইলে এমন বুদ্ধিমান স্বামী জুটেছে আমার ঘাড়ে? কি বল দিদি। কি, কথা বলছ না যে।"

কথা আর কী বলবে পার্বতী। সে বুঝি সত্যিই বোবা হয়ে গিয়েছে। আর কোনো কথা না বলে নয়নতারা তার স্বামীর সঙ্গে বিদায় নিল দিদির কাছ থেকে।

পার্বতী বলল, "আজ আলাপ করা হল না। আর-একদিন আসবেন।"

নয়নতারার মুখের দিকে চাইল বৈদ্যনাথ, তারপর হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলল, "আসব।"

অদ্ভুত। বড় অদ্ভুতই লাগছে বৈদ্যনাথের। কেবল বই আর খাতা নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে বয়স বাড়িয়ে ফেলল সে। ঘরের বাইরে যে এমন-একটা আশ্চর্য জগৎ আছে, এ খোঁজ জানাই ছিল না তার। রাস্তায় নেমে এসে বৈদ্যনাথ বলল, "খুব সিম্‌প্‌ল্। খুব সোবার্। তোমার দিদি লোক নিশ্চয় খুব ভালো। এত বড় একজন আর্টিস্ট, কিন্তু একটুকু অহংকার নেই। সাজ-গোজে এতটুকু আড়ম্বর নেই।" একটু বুঝি বিরক্তই হল নয়নতারা। বলল, হুঁ। তোমার খুব মনে ধরেছে। তুমি খুব সিম্‌প্‌ল্ কিনা। অল্পস্বল্প সিম্পল তুমি নও—এক আউন্স দু আউন্স নয়—এক টন।"

"তার মানে?"

"এরও মানে বুঝলে না। তুমি সত্যিই একটা আস্ত সিম্‌প্‌ল্ টন।"

হাত তুলে বৈদ্যনাথ গাড়ি ডাকল, "এই ট্যাক্সি।" স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে তীরবেগে ল্যান্স-ডাউন রোড ধরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে ছুটে চলল হাওয়া গাড়ি। নয়নতারা বলল, "সত্যিই একটা বোকা তুমি। বাকিটা আমাকে দিয়ে করাতে চায় কি না চায় সে-কথা ওখানে বলার মানে?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"দিদির মনে লাগতে পারে তো?"

বৈদ্যনাথ বলল, "তোমার দিদি তোমাকে ডেকে নিয়ে এল এ-লাইনে, আর তুমি একটা চান্স পাচ্ছ দেখে সে হিংসে করবে? কী তোমার বুদ্ধি!" নয়নতারা তার কপালের উড়ন্ত গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল একটু সামাল ক'রে বলল, "আমার উন্নতি ও চায় বটে, কিন্তু নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে কি আমার উন্নতি চায়?" বৈদ্যনাথ আপোস করে নিতে চাইল, বলল, "থাক্। ও-কথা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। যা হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু ভাবছি হেরম্ব, রেবতী, বিজয় তো চটে লাল হয়ে আছে। তোমার দিদির দুর্নাম রটাবে নিশ্চয়। বিজয় সোম আবার পাকা প্রোপা-গাণ্ডিস্ট—সত্যিই যে তোমার দিদি বোবা হয়ে গেছে, নিশ্চয় তা প্রচার করার জন্যে সে কোমর বাঁধবে এবার।"

"বাঁধুক।" শক্ত হয়ে বসল যেন নয়নতারা, মনে হ'ল সেও যেন আঁট ক'রে জড়িয়ে নিল শাড়ী। সে যেন তার উন্নতির সংকেত পেয়ে গেছে। বলল, "যে-লাইন যেমন। এ-লাইনে এলে অত সিম্‌পল্ আর অত সোবার্ হলে চলে না। সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, হাসতে হবে, খেলতে হবে।"

বৈদ্যনাথ একটু ঝুঁকেই তাকাল তার স্ত্রীর মুখের দিকে, বলল, "কিন্তু তোমাদের মনক্কাও তো আজকাল একটু গম্ভীর আর একটু রাশভারি হচ্ছে—কই, এ-লাইনে কোনো অসুবিধে তা সে ভোগ করছে না।"

"দোহাই।" নয়নতারা যেন দুই হাত দিয়ে তার স্বামীর মুখ চেপে ধরল, বলল, "ওর কথা তুলো না। আমরা হচ্ছি ভদ্রঘরের মেয়ে, ভদ্রঘরের বউ। কার সঙ্গে কার তুলনা করছ বলো তো?" হতভম্ব হয়ে বৈদ্যনাথ, বলল, "তা বটে। কুলবধূর সঙ্গে কি বরবধূর তুলনা হয়? আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু—" বৈদ্যনাথ রাস্তার দিকে তাকাল, ট্যাক্সিকে ডান দিকে বাঁক নিতে নির্দেশ দিয়ে নয়নতারার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "কিন্তু মনক্কাও তো এখন কুলবধূ। সে তো এখন মিস্ দ্রাক্ষা নয়, মিসেস দ্রাক্ষা বসাক।" নয়নতারা তার স্বামীর দিকে না তাকিয়ে একটু ঝাঁজ দিয়ে বলল, "থামুন মিস্টার মুখার্জি। লেকচার দেবেন কলেজে গিয়ে, এখানে নয়। আজ মিসেস বসাক বটে, ক দিন থাকে এই পরিচয় দেখা যাক।" বৈদ্যনাথ একটু ব্যাকুল ভাবেই যেন বলল, "আর তোমার পরিচয়টা ঠিক থাকবে তো মিসেস মুখোপাধ্যায়?"

"কেন, সন্দেহ আছে নাকি?"

"সন্দেহ নয়। আশঙ্কা।"

নয়নতারা কোনো আশ্বাসের কথা বলার আগেই তাদের ট্যাক্সি পৌঁছে গেল স্টুডিয়োর ফটকে।

বিজয় সোম। বিজয় দাঁড়িয়ে ছিল ফটকে। এখানি নাকি মনক্কার আসবার কথা, তারই প্রতীক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ট্যাক্সি থেকে নামল। বৈদ্যনাথ ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে ওদিকে।

বিজয় মৃদু হেসে বলল, "অপেক্ষা করছিলাম আমড়ার, এসে গেল আম।"

একটু হেসে নয়নতারা বলল, "অর্থাৎ।"

"এরও ব্যাখ্যা দিতে হবে? কিন্তু খবর কি নিয়ে এলে শুনি।" বিজয় নয়নতারার মুখের দিকে তাকাল।

বিজয়ের মুখ থেকে হঠাৎ তুমি সম্বোধন শুনে নয়নতারা সামান্য একটু চমকে উঠল, চমকটা কাটিয়ে সে সংক্ষেপে জানাল খবরটা।

উল্লসিত হয়ে উঠল যেন বিজয় সোম, বলল, "এ নিউ স্টার ইন আওয়ার হোরাইজন। আমি তোমাকে নিয়ে কী ভাবে প্রচার করি দেখ। চল, হেরম্বরা অপেক্ষা ক'রে বসে আছে; তাদের গিয়ে খবরটা দেওয়া যাক আমাদের দিগন্তে নূতন তারার আবির্ভাব ঘটেছে।"

ওরা এগিয়ে চলল, বৈদ্যনাথ আসছে পিছন-পিছন আসছে। বকুলের ব্যাকুল গন্ধ এসে লাগল তাদের নাকে, বিজয় বলল, "কী মাইল্ড। কী সুইট।"

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, "কি?"

"ওই বকুল।" কয়েক পা হেঁটে বিজয় বলল, "আর, আমার সঙ্গীও।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল নয়নতারা, বলল, "আপনি নিশ্চয় কবি। ফুলের গন্ধে এমন পাগলা হয়ে যান।"

বিজয় বলল, "ছিলাম বটে কবি। কবিতাও লিখেছি বিস্তর। কিন্তু আর ভালো লাগল না, তাই এখানে এসে হলাম প্রচারসচিব।"

"ভালোই করেছেন।"

তা আর বলতে? কবিতা লিখতাম কল্পনার সুন্দরীদের নিয়ে, এখানে এসে পেয়ে গেলাম জীবন্ত—"

"থাক্। চুপ করুন। মিস্টার মুখার্জি আসছেন।"

পিছনে তাকিয়ে বিজয় বলে উঠল, "এ কি মশায়, পিছিয়ে রইলেন কেন? এগিয়ে আসুন। শুভসংবাদ শুনতে শুনতে উৎসাহে পা চালিয়ে জোর কদমে চলেছি আমরা। মিসেসের তো এবার পোয়া বারো।"

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, "যার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি তো এলেন না।"

"কে?"

"মিসেস বসাক।"

হেসে উঠল বিজয় সোম, "ওঃ। মনক্কা? দ্রাক্ষা? এসে পড়বে এখনি। ভোরের আলোর ছোট একটা সেটে একটা রি-টেক আছে। ও এখন মোটা খুঁটিতে ভেলা বেঁধেছে, ওকে পায় কে? আমাদের দিয়ে কাজ তো গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে ওর।"

"কি কাজ?" নয়নতারা কিছু না-বোঝার ভঙ্গি ক'রে জিজ্ঞাসা করল।

"ছি।" বিজয় বলল, "আপনারা কুলবধূ, সেসব কথা আপনাদের জানা ঠিক না। কি বলেন, মিস্টার মুখার্জি?"

বৈদ্যনাথ মাথা নাড়ল।

বিজয় বলল, "আমার হাতে কাগজ, আমার হাতে কলম। মিসেস মুখার্জিকে এবার আমি কী দাঁড় করাই দেখুন।"

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, "কি?"

"গ্রেটেস্ট আর্টিস্ট ইন ইণ্ডিয়া নয়, গ্রেটেস্ট আর্টিস্ট ইন দি ইস্ট। এশিয়ার মধ্যে সেরা নটী।"

শেষের কথাটা শুনে বৈদ্যনাথের বুকের ভিতরটা ধক্ ক'রে উঠল। নয়নতারার দুচোখ ছলছল ক'রে উঠল, প্রবল আবেগে থরথর ক'রে যেন কেঁপে উঠল তার ঠোঁট।

নয়নতারা বলল, "আমার নিজের যদি কোনো শক্তি না থাকে—"

"না থাক্। ভক্তিতে হবে। ভক্তরা সে ভার নেবে। যেমন আমি নিলাম।"

কথাটা ব'লেই বিজয় নয়নতারাকে আলগোছে ছোট্ট একটা ইশারা করল, হেসে ফেলল নয়নতারা। লোভে নয়নতারার চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বিজয় সোমের দিকে কটাক্ষে তাকাতে লাগল। বৈদ্যনাথ বলল, 'চলুন। ওঁরা বুঝি বসে আছেন। হেরম্ববাবুরা।"

যেন খেয়াল ছিল না কারো কথা। যেন হঠাৎ মনে করিয়ে দিল বৈদ্যনাথ, এই রকম ভাণ ক'রে বিজয় সোম বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। চলুন। ওরা সব স্টুডিয়োর মধ্যে বসে জটলা করছে।"

আর কয়েক পা মাত্র তার পরেই স্টুডিয়োর দরজা। দরজার পাশেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সাউণ্ড-ট্রাক।

বিজয় বলল, "একটা কথা সেরে নিই। কয়েকটা স্টিল-ছবি আমি নিয়ে নেব। তার জন্যে একটু সময় দিতে হবে আজ। পাবলিসিটি, মানে প্রচার, এই কাজটির জন্যে ছবি তো দরকার।

নয়নতারার চোখের তারা-দুটি চিকচিক করে উঠল, তার স্বামীর দিকে একটু তাকাল, কিন্তু সেদিক থেকে সমর্থনের কোনো ইঙ্গিত পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে বলল, "নিশ্চয়। তাতে আর আপত্তি কি। বরঞ্চ এতে আগ্রহই আছে। কি বল?" বৈদ্যনাথ সজোরে মাথা নেড়ে উঠল। সম্ভবত সম্মতিরই।

বিজয় বিগলিত ভঙ্গিতে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আর্টিস্টদের কাছে আমাদের দাবি আর কতটুকু? তাদের কাছ থেকে আমরা যা চাই তার নাম কোঅপারেশন। একটু সহৃদয়তা। তাহলেই আমরা ধন্য।"

বৈদ্যনাথ কি বুঝল জানি নে, বিজয়কে বলল, "ধন্যবাদ।"

বিজয় হেসে উঠে বলল, "না। ও কথা বলবেন না, ওটি বাদ দিতে চাইবেন না। আমরা একটু ধন্য হতে চাইই।"

বিজয়ের রসিকতায় খিলখিল করে হেসে উঠল নয়নতারা।

উদ্ধৃতির আতঙ্ক

শ্রীনেহেরু একবার বলেছিলেন—It is dangerous for politicians to write books—কারণ নাকি যে কোন পাঠকই তা থেকে খণ্ডিত অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

উক্তিটি সরস এবং নিঃসন্দেহে সেটা তাঁরই আতঙ্কগ্রস্ত মনের পরিচয়। শোনা যায়, গ্রন্থ-রচনা অশায়েস্তা মুহূর্তের তাগিদ। বিশেষ, মনীষীদের বেলায় ত' বটেই। বিরাট ভাবসমুদ্রে কত খুটিনাটি মুহূর্তের চিন্তাধারা তাছাড়া তাঁদের সমগ্র জীবন পরিক্রমায় কত অলৌকিক, অসাধারণ ঘটনার সন্নিবেশন হয়। সেই কারণে দেখা যায় চিন্তাধারার মৌলিকতা সত্ত্বেও অনেক সময়ই তা সঙ্গতিহীন এবং হয়ত পরস্পরবিরোধী। তবুও এইটুকুই বিশেষত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই সঙ্গতিহীনতা ও পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার চতুর অন্বেষণ যদি আলোচনাকারী-দের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে তাহলে ত' গ্রন্থরচনাই চলে না; এবং সেক্ষেত্রে পৃথিবীর তাবৎ মনীষীবৃন্দের উচিত একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে জীবিকা-জীবন শেষ করে মাত্র একখানা বই লেখা—আত্মচরিত। কিন্তু তা সম্ভব নয় আর সম্ভব নয় বলেই শ্রীনেহেরুর আশঙ্কার অনাদর হওয়া উচিত নয়। বরং বলা যেতে পারে আশঙ্কা শুধু রাজনীতিবিদ বা দেশনায়কদের মধ্যেই সীমিত নয়। এ আশঙ্কা সর্বজনীন, সর্বস্তরের লোকের।

উদ্ধৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতি-আলোচনার কথা বাদ দিলেও তার মূল্যবোধ অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে সবাই একমত যে উদ্ধৃতি শুধু যে রচনানীতির শালীনতাই বাড়ায় তা নয়, তাকে যথেষ্ট শৈলীপ্রধানও করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বক্তব্যবিষয়ের জটিলতা অস্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গির দরুণ জটিলতর হয়ে উঠেছে। সে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও মনোজ্ঞ উদ্ধৃতির স্বাদ সত্যই আকর্ষণীয়। রচনারীতিকে অলঙ্কারমুখর ও ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে সব দেশের সব লেখকই উদ্ধৃতির ব্যবহার করেন। প্রায়ই তাই দেখাও যায় বিষয়বস্তুর গুরুত্বানুযায়ী রচনারীতিতে উদ্ধৃতির অবকাশ থাকে। উদ্ধৃতির এ হ'ল একটা দিক মাত্র। পরীক্ষার খাতা থেকে শুরু করে ভবিষ্যত কর্মজীবনে ধন্য ও মান্য হওয়ার শেষ অধ্যায় অব্দি এইভাবেই আমরা মনীষা ও প্রতিভার স্মরণ করে আসছি। কিন্তু উদ্ধৃতির আর একটা দিক আছে—আশঙ্কার দিক। শ্রীনেহেরুর দার্শনিক উক্তির জন্ম ওই আশঙ্কা থেকে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন, জার্মান কবি গোটের অমর কাব্য "ফাউস্টে" শয়তান মেফিস্টোফিলিয়ের যে উক্তি তাকে যদি কবির নিজের উক্তি বলে কেউ মনে করেন তাহলে কাব্যসাহিত্য বিচারে তাঁর আপন অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেবেন। রাসেল সাহেবের এ আতঙ্ক যুক্তিহীন নয়। বরং এমন অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় যে অনবধানতা নয় তার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত হ'ল রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসখানি যখন সবুজপত্রে মুদ্রিত হচ্ছে তখন থেকেই উপন্যাসটির নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা কবি পেতে শুরু করেন। মূল কটি সমালোচনা হ'ল নিম্নরূপ।

(১) ঘরে বাইরে রচনার উদ্দেশ্য (২) নিখিলেশ চরিত্রের দুর্বোধ্যতা (৩) সন্দীপের

অসংযম উক্তি। উপন্যাস বা গল্পে জোর করে উদ্দেশ্য অন্বেষণ-বৃত্তি কবির মতে নিছক রাজনীতি। ওথেলোর দৃষ্টান্ত তুলে তিনি বলেছেন যদি তেমন উপদেশ, তত্ত্ব বা উদ্দেশ্যসন্ধানীর মনে হয় যে কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল ওথেলোপ্রতি ডেসডীমোনার "একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নিদারুণ পরিণাম দেখিয়ে—সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত কিংবা ইয়াগোর চাতুরীকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করে সরলতার প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ" তাহলে বিভ্রান্তকারীর প্রচার সাধনার সামায়িক সিদ্ধিলাভ হয়ত হতে পারে, কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারের মনের সাগর ছেঁচে এই উদ্দেশ্য, তত্ত্ব আহরণ প্রবৃত্তি সাহিত্য-বিচারের পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা। মাত্র এইটুকু নয়। রবীন্দ্রনাথের ওপর সবচেয়ে সাংঘাতিক অভিযোগ ছিল, ঘরে-বাইরে উপন্যাসে কবি সীতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন কি, আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম, লোকে উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছে এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্বাসিত হইয়াছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি ঘরের টেবিল হইতে নির্বাসিত থাকিল।"

নীতিবাগীশ সমালোচকবর্গ তাঁদের বক্তব্যের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সন্দীপের উক্তি উদ্ধৃত করেন। ঠিক উক্তি না বললেও, আত্মসমালোচনা বলা চলে একে। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে যেটুকু স্বাভাবিকতা সেটুকুরই পূর্ণ প্রতিফলন পাই আত্মচিন্তায়। উপন্যাসে, সন্দীপ-বিমলার সম্বন্ধটি খুব স্পষ্ট না হয়েও রহস্যপূর্ণ নয়। সন্দীপের মনের অলি-গলিতে অস্পর্শিত বিমলার অনুধ্যান অনেকটা রাবণরাজার মতই। তাই সন্দীপ ভাবতে পেরেছিল "যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক-বনে রেখেছিল। অত বড় বীরের অন্তরের মধ্যে ওই এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল, তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজা করত।"

বিস্তারিত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। উৎসাহী পাঠক "সাহিত্যবিচার" পড়ে দেখতে পারেন এবং অবিমৃষ্যকারিতা প্রসঙ্গে এই দীর্ঘায়ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। মোট কথা, সাহিত্যের ভাণ্ডার যাঁর অফুরন্ত তাঁরই সংগ্রহশালা থেকে বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা খণ্ডিত অংশ আপন উদ্দেশে কাজে লাগান। হয়ত আইনত তিনি দণ্ডনীয় নন্, কিন্তু যাঁর খণ্ডিত উদ্ধৃতি নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি হল, অনেক ক্ষেত্রেই পাঠক পূর্বাপর সম্বন্ধ বিষয়ে হতে তাঁকে বিচার করে আর এক ভাবে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কথা এসেই পড়ে। ধরা যাক না, সাহিত্যে কুম্ভীলক-বৃত্তির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত তিনি আপন যুক্তির সাথে বীরবলের যুক্তি জুড়ে অনায়াসেই বলতে পারেন যে বীরবল বলেছেন "মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করার সকলেরই সমান অধিকার আছে"। অবশ্য বীরবলের মূল বক্তব্যের সঙ্গে ওই খণ্ডিত অংশটুকুর কেমন সম্বন্ধ তা কেউ জানুক না জানুক, সাহিত্যে চৌর্যপরাধের স্বপক্ষে ওই খণ্ডিত অংশটুকুই কী যথেষ্ট নয়!

মোটকথা দৃষ্টান্ত দিয়ে যা বলা হল তা হল উদ্ধৃতিকারের "মন ভোলাবার ছলা কলা" পদ্ধতি —যা অবশ্যই লেখকের মুশ্কিলআসান। এ মুশ্কিলআসান অস্বীকার করা যায় না কারণ একদল সুধী-জনের মতে ঠিক সময়ে ঠিক কথার ব্যবহারই যথার্থ প্রতিভা। বিশল্যকরণী খুঁজে নেওয়াটাই ত' কীর্তি! গন্ধমাদন বয়ে আনার দুর্জয় সাহসিকতাটুকু সে কৃতিত্বর কাছে নিতান্তই নস্যং।

সুতরাং যাঁর বাণী উদ্ধৃত হল তিনি সেখানে গোণ, পরশ-পাথর অন্বেষণকারীর প্রতিভাই মুখ্য। কিন্তু উদ্ধৃতিকারের এই পরশপাথর অন্বেষণ বৃত্তিতে যতই কৃতিত্ব থাক, তার উদ্ধৃতি যে মূল লেখকের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে না কে বলতে পারে! উদ্ধৃতিতার ত' মূল লেখকের অবিশ্রাম কীর্তি থেকে রত্ন আহরণ করে গরীয়ান হলেন কিন্তু রত্নভাণ্ডারে যাঁর সৃষ্টি প্রতিভার সাক্ষ্য, তাঁর নিরাপত্তার জামিন কোথায়! বর্তমান কালের চলচ্চিত্র-শিল্পে এই আটৈঁ মাত্রাধিক্য প্রয়োগটুকু উল্লেখ না করে পারা যায় না। প্রেমাভিলাষী নায়ক-নায়িকার মুখে মুখে প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাথের সেই সব সাধনসঙ্গীত যার আদর্শগত বা নীতিগত পর্যায় সম্বন্ধে প্রচারকর্তারা নেহাৎই অজ্ঞ। অথবা বৈষ্ণব পদকর্তাদের বিরহসঙ্গীত। কৃষ্ণপ্রেমের সে কাব্য তার বিলাস বিচিত্রতাময়। লৌকিক প্রেমের মত সেখানে দেহতর্পনেচ্ছা নেই। সেখানে শ্রীরাধিকার অন্তরের আকুতি হল কৃষ্ণসুখ। নারীর অন্তরের ধন। কিন্তু নেহাৎই জীবপ্রেমের আখ্যানভাবে যদি শ্রীরাধিকার বিবশ আত্মার আকুতির উদ্ধৃতি দেখা যায়, তাহলেই মনটা বিমুখ হয়।

উদ্ধৃতির গুণাগুণ বিচারে যা বলা হল, জ্ঞানীগুণীর কাছে তার কেমন আদর হবে জানা নেই। তবে রসিক পাঠকের কাছে এর আদর উপেক্ষণীয় হবে না। কারণ উদ্ধৃতির সঙ্গে আতঙ্কের সুস্পষ্ট সম্বন্ধটা অনুধাবন করে তাঁরা পূর্বাহ্নেই সচেতন হতে পারেন। উদ্ধৃতি-সহযোগী যে রচনা তাতে বক্তব্য বিষয় স্বচ্ছ হয়; কিন্তু উদ্ধৃতি-সমৃদ্ধ রচনা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় বুদ্ধি বা বিচারশীল মনের বিশ্লেষণী প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে; কিংবা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে মনের শিল্পবোধ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। শেষোক্ত আতঙ্কও যুক্তিহীন নয়। উদ্ধৃতির মাত্রাহীন প্রয়োগ ও আলোচ্য বিষয়ের গতানুগতিক বিচারই যদি আলোচনা সাহিত্যের মূল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভাবের ক্ষেত্রে যে দৈন্য তা কী ঢাকা পড়ে যাবে! আলোচনা-স্তম্ভের প্রতি গাঁথুনিতে যে কৃতিমতা ও যান্ত্রিকতার অঙ্কুরোদ্গম হবে, মনের শিল্পবোধের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করতে কি সেটুকুই যথেষ্ট নয়।

রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত

বর্তমান রঙ্গমঞ্চে 'একাঙ্কিকা'-র প্রভাব

নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। অধিকাংশেরই অভিমত, থিয়েটারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পেশাদারী দলগুলির দিকে দৃকপাত করলেই বোঝা যাবে যে নাটক অভিনয়ের চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেও যখন রূপালী পর্দার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হল না তখন যেন দৃশ্য সজ্জার টেক্‌নিক উন্নততর করে যাতে সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে সেই দিকে নজর রেখেই নতুন নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। অর্থাগমের দিক থেকে সিনেমার সাফল্য দেখেই বোধকরি পেশাদারীমঞ্চের ধারণা হয়েছে যে শিল্পপরিবেশন ক্ষেত্রে মঞ্চ ও রূপালী পর্দা সমধর্মী। এমনকি একথাও যে মঞ্চের সবকিছুই ছায়াচিত্রের মধ্যে ধরে গিয়েছে এবং তাছাড়াও রয়েছে পরি-বেশনের টেক্‌নিকে ছায়াচিত্রের সুবিধা। তাই মঞ্চকে রূপালী পর্দার টেক্‌নিক ঘেঁসা করবার ভুলপথ বেছে নিয়েই মঞ্চশিল্পে সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চই যদি নাট্যশিল্পের একমাত্র পরিবেশনের মাধ্যম হত তাহলে হয়ত তার অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকতো না। কিন্তু বাংলা নাট্যশিল্পের উল্লেখ-

যোগ্য অঙ্ক হল অপেশাদারী মঞ্চের নির্ভীক অভিযান। অধুনা অনেক সখের দলের খবর চোখে পড়ে এবং জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার নমুনাও দেখা যায় প্রচুর। একদিকে যখন পেশাদারী মঞ্চগুলির দর্শকবৃন্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে অন্যদিকে সখের দলগুলির অভিনয় দেখার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত নেই। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে রূপালী পর্দার উন্নতি মঞ্চের অবনতির কারণ নয় এবং পেশাদারী মঞ্চ অপেশাদারী দলগুলির থেকে মঞ্চশিল্পে অনেক পেছিয়ে পড়েছে।

পেশাদারী মঞ্চ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে,—কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকতার হাত থেকে এখনও বেরোতে পারেনি। পুরাতন মঞ্চাভিনয়ের সাফল্যের দিকে নজর রেখে এঁরা অর্থাগমের ভিত্ পোক্ত করতে চান। তাই নামকরা পুরাতন নাটকগুলি বা তারই আদর্শে নতুন নাটক উন্নততর টেক্‌নিকের সাহায্যে পরিবেশন করতে পারলেই অর্থাগমের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে করেন।

নাটকের মূল কথা হল সংঘাত। কখনও বা মানসিক কখনো বা বাহ্যিক সংঘাতের অবতারণা করে নাটক গড়ে ওঠে। পুরাতন নাটা-পদ্ধতি হল যুদ্ধ বিগ্রহের অবতারণা করে সংঘাত লাগিয়ে তোলা অথবা কথার উপর কথার জাল বুনে মানসিক সংঘাত দেখানো। তার পটভূমিকাও ছিল নিতান্তই সঙ্কীর্ণ এবং মানব মনের প্রাথমিক চাহিদানুযায়ী 'মিলনান্তক' 'বিয়োগান্তক' 'হাস্যরসাত্মক' ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগের মধ্যেই নাটকের পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়াবেগ এবং চরিত্র চিত্রণের মধ্যেই ছিল এর সীমারেখা। সাধারণতঃ নাটকে চরিত্রের গতি নিয়ন্ত্রিত হত নিয়তির সাহায্যে, তাই নাটক আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে পরিণতি স্পষ্ট হয়ে পড়লেও পরিণতির ক্রমে নিয়তির কর্তৃত্ব দর্শকদের আকর্ষণ করতো। এগুলি নাট্যশিল্পের দোষ নয় বরং গুণই বলতে হবে, যখন এরই ওপর "ওথেলো", "কিংলীয়র, চন্দ্রগুপ্ত" বা প্রফুল্লর সাফল্যজনক অভিনয় রজনীগুলি নির্ভর করেছে। কিন্তু বর্তমান সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এর দোষ ধরা পড়েছে।

এখন ছোট নাটকের অভিনয়ের উপরই ঝোঁক বেশী। সেই ছোট পূর্ণাঙ্গ নাটক ক্রমশ একাঙ্কিকার দিকে বেশী ঝুঁকেছে এবং নতুন একাঙ্কিকা লেখা ও অভিনয় প্রচেষ্টায় জনসাধারণের স্পৃহা দেখা দিয়েছে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষীণকায় নাটক বা নাটিকার উদ্ভাবনের যৌক্তিকতা চিন্তা করলেই ইংরাজী-মঞ্চ-ইতিহাসের কথা উল্লেখ করতে হয়। ইংরাজদের রাত্রের খানার সময়ের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্যে মূল নাটকাভিনয়ের আগে ছোট ছোট নাটিকা (কথোপকথনের ধাঁচে) গড়ে ওঠে। ইংরাজীতে এদের বলা হত "কার্টেন রেজার।" (cartain raiser)। যাঁদের দেরীতে খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁরা এই সময়টুকু পার করে অথবা এই অভিনয়গুলির মধ্যেই থিয়েটারে পৌঁছতেন। এই "কার্টেন রেজার"গুলি প্রথমতঃ অপেক্ষমান অস্থির দর্শকদের শান্ত করতো এবং দেরীতে আসা পৃষ্ঠপোষকদের অভিনয় দেখবার সুযোগও বজায় রাখতো। ১৯০৩ সালে ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটারে এইরূপই একটি ছোট নাটিকা W. W. Jacobsএর নাট্যরূপ দেওয়া monkey's paw অভিনীত হবার পর অনেকেই মূল নাটকাভিনয়ের জন্য অপেক্ষা না করে সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরে যান এইরকম শোনা যায়। সেই থিয়েটারেরর মালিক শুনেছি এরপর "কার্টেন রেজার" দেখানো বন্ধ করে দেন যদিও নাটিকার স্বাদ জনসাধারণ তখন পেয়ে গিয়েছে।

নাটিকা বা একাঙ্কিকার নাট্যরস, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকাবর্জিত।

যে কোন হৃদয়াবৃত্তি ও সামাজিকতার পরিপ্রেক্ষিতে নাটিকা গড়ে ওঠে। মানসিক বৃত্তিধর্মকে সংঘাতের ভিতর দিয়ে জাগ্রত করাই এদের কাজ। নতুন নতুন বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে এগুলি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। চরিত্র চিত্রণের বা কথার মালা দিয়ে বিষয়বস্তুর পরিচয়ের অবকাশ না থাকলেও নাট্যরস ব্যহত হয় না। চিরাচরিত প্রথামত নাটকের দুর্বল অংশটুকু ঢাকবার জন্য মাঝে মাঝে সংঘাতের চরম উত্তেজনা দেঁথিয়ে (climax) পার পাবার প্রচেষ্টা থাকে না এবং সুরু থেকেই জমাট বেঁধে নাটিকাগুলি এগিয়ে চলে চরম পরিণতির দিকে। আধুনিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা বোধকরি এই নাটিকাগুলির উপরই নির্ভর করছে তাই নাটক বাছতে বসে সখের দলগুলি একটার পর একটা পুরাতন পদ্ধতির নাটকগুলি বর্জন করে নতুন এই একাঙ্কিকা বা নাটিকাগুলির ওপরই মনোনিবেশ করেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ধরনের নাটক বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই তাই এখনও নির্ভর করতে হয় খ্যাতনামা লেখকদের ছোট গল্পগুলির নাট্যরূপ এবং ইংরাজী playlet গুলির ভারতীয় রূপ প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

বিরিঞ্চি বাবা প্রসঙ্গে

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পরমশ্রদ্ধেয় "পরশুরাম" বিরিঞ্চি বাবা ও শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর (সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্) চরিত্র অঙ্কন করিয়া এইসব ভণ্ড সাধু সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী এই চরিত্র দুইটিকে ব্যঙ্গ চিত্র হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে, এইসব ভণ্ড দুষ্টদের সম্বন্ধে কোন সাবধানতা অবলম্বন করে নাই। ফলে ইহাদের প্রতাপ অব্যাহতই আছে বরং দেশে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধির কল্যাণে(!) ভয়াবহরূপে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইঁহারা সহস্র সহস্র শিষ্য ও তাঁহাদের আশ্রিত পরিবারবর্গের মস্তক নির্বিবাদে চর্বণ করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিতেছেন। সাম্প্রতিক বহু গল্প উপন্যাসে এই সব বাবাদের কীর্তিকলাপ উল্লেখিত হইতেছে, যাঁহারা চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া থাকেন না তাঁহারা জানেন, এই সব গল্প উপন্যাস বর্ণিত বিবরণগুলি সত্যের সহিত সম্পর্কহীন নহে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা গুলিতেও এই সব বাবাজী মহারাজদের বহু কীর্তিকলাপের কাহিনী বহুসময়ে প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালী জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এই হাঙ্গর, কুম্ভীর, অক্টোপাসশ্রেণীর গুরু মহারাজদের দ্বারা কবলিত। ইহাদের দ্বারা সম্মোহিত শিষ্যদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা এমন কি নিজস্ব ধনসম্পদ বলিতে কিছুই থাকে না। যুবতী স্ত্রী অথবা কন্যা থাকিলে অনেকক্ষেত্রে তাহাদিগকেও মহারাজের অথবা "বাবার" শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত করিতে হয়। আসামের এক বাঙ্গালী "বাবা" এমনি এক নিরীহ শিষ্যের স্ত্রীকে করায়ত্ত ও আশ্রমজাত করিয়াছিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও জবরদস্ত অফিসর হইয়া মাতাকে বহু কষ্টে উদ্ধার করেন। অতি অল্পদিন পূর্বে এইরূপ এক বহুশিষ্য-শিষ্যা-সেবিত "বাবা" শিষ্যা-সম্ভোগের অপরাধে ধরা পড়িয়াছিলেন। এই বিচারকাহিনী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঠ করিবার দুর্ভাগ্য সকলেই বহন করিতে হইয়াছে। যে বাবা শিষ্যা পরিবৃত হইয়া থাকেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ স্ত্রী সম্ভাষণে যিনি বিরত নহেন এইসব 'সাধু' সম্বন্ধে স্বতঃই মানুষের সন্দেহ জাগা উচিত। মোহগ্রস্থ শিষ্যাশিষ্যাদের গুরুর চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে বিস্ময়কর ঔদাসীন্য দেখা যায়। প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এক প্রিয় সহচরের মুখ দর্শন করেন নাই, এই শিষ্য মনোদুঃখে প্রয়াগে গিয়া আত্মহত্যা করেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত-শিষ্য মহাশয়দের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

এইসব বাবাদের দ্বারা শোষিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর পারমার্থিক কি সুবিধা হয় তাহার হিসাব বাহির করা কোন সংখ্যাতত্ত্ববিদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে অসংখ্য পরিবারের ঐহিক সুখ-শান্তি ও ভবিষ্যৎ যে এইসব বাবারা নষ্ট করিয়া দিতেছেন তাহা ত চর্মচক্ষেই বেশ অনুধাবন করা যায়। শিষ্য-শিষ্যাদের ত্যাগ সংযম ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি অতি সদুপদেশবর্ষণকারী এইসব ভণ্ড সাধুর দল রাজোচিত ঐশ্বর্যের মাধ্যমে সকল রকম ভোগবিলাসের মধ্যে বহুক্ষেত্রে স্ত্রীপুত্র সহ নিজ আশ্রমে মহানন্দে কালাতিপাত করে। ইহারা বিবাহিত শিষ্য-শিষ্যাদের দাম্পত্য-সুখ হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে বঞ্চিত করিয়া রাখে। অপরিণত বুদ্ধি বালক অথবা শিশু শিষ্যপুত্র ও

শিষ্যকন্যাকেও শৈশবেই ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণী রূপে দীক্ষা দিয়া ইহারা তাহাদের উপর ভবিষ্যৎ প্রভুত্বের ব্যবস্থা পাকা করিয়া লয়। ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া গেলেও অসংখ্য বাবার আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যা ও তাহাদের গৃহস্থাশ্রম-জাত পুত্রকন্যারা বাবাদের ক্রীতদাস-দাসী ব্যতীত আর কিছু নহে। পুরুষানুক্রমিক ক্রীতদাস-দাসী এইসব হতভাগ্য-হতভাগিনীদের মুক্তির জন্য কোন দিন কোন উইলবারফোর্স অথবা লিঙ্কলন আমাদের দেশে আবির্ভূত হইবেন কিনা কে জানে?

দেশে যেখানে যত সাধু-সন্ন্যাসী-মঠাধীশ, গুরু, ধর্মোপদেষ্টা আছেন তাঁহারা সকলেই ভণ্ড ও প্রতারক এবং মঠ-আশ্রম মাত্রই ব্যাভিচারের লীলাক্ষেত্র ইহা প্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ চেষ্টাও বাতুলতার নামান্তর। সত্যধর্ম ন্যায়নীতিরই একটা আদর্শ রূপ। প্রকৃত ধর্ম সুস্থ মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর হইতে শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক কালের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রমণ মহর্ষি প্রভৃতি বহু ধর্মনেতা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সুস্থ জীবন ও নীতি ধর্মের পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে জনসাধারণের ক্ষীয়মান নীতিবোধ লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুত জয়প্রকাশ-নারায়ণের মত বাস্তববাদী নেতাও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে জাতির নৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এখন শ্রীঅরবিন্দ অথবা রমণমহর্ষির নেতৃত্ব প্রয়োজন। যে সময়ে জয়প্রকাশজী ইহা বলেন যে সময় শ্রীঅরবিন্দ ও রমণমহর্ষি দুইজনেই জীবিত ছিলেন। এই সন্ন্যাসী ও ধর্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে জনসাধারণের যে সহজাত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহাকে ভাঙ্গাইয়া যাহারা ব্যবসা করে তাহারা কি সমাজের জঘন্যতম দুর্বৃত্ত নহে? এই ধর্মের নামে যে সব ধূর্ত ভণ্ড লম্পটেরা বহু নরনারীকে সম্মোহিত করিয়া নিজেদের ঘৃণিত কামনা পরিতৃপ্তির ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করিতেছে জনসাধারণের তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। মডার্ন ভুঁইফোঁড় বাবাদের চিনিয়া লওয়া মোটেই শক্ত নয়। ভক্তি বিহ্বল গদ্ গদ্ ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলে সহজেই আসল সাধু ও ভণ্ড বাবাদের প্রভেদ ধরা পড়ে, আসল মঠ আশ্রম ও ব্যাভিচারের লীলা-ক্ষেত্রের পার্থক্য ধরা পড়িতে দেরী হয় না। শুধু যে দৃষ্টি থাকিলে আসল নকলের প্রভেদ ধরা পড়ে আমাদের মধ্যে সেই দৃষ্টির অভাব। আমাদের নিজেদের চরিত্রের শৈথিল্যও ইহার জন্য অনেকটা দায়ী।

সরকারের পাওনা ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দিয়া অথবা জাল-ঔষধের কারবারে ধরা পড়িয়া আমাদের অনেকে সাধু বাবার সন্ধানে বাহির হন। সুচতুর বাবা এইরূপ ভক্ত পাইলে যে বেশ কিছু দোহন করিয়া লইবেন এবং ক্রমশঃ বাগুরা-বদ্ধ ভক্তের স্ত্রী-কন্যার দিকে হাত বাড়াইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? পরীক্ষার পড়া না পড়িয়া পাশ করিতে হইবে—দৌড়াও বাবার কাছে, যোগ্যতা নাই অথচ ভাল চাকুরী চাই যাও বাবার কাছে, ব্যাভিচারের মামলায় পড়িয়াছ চল পরিত্রাতা বাবার কাছে—এই করিয়া আমরাই এই সব ধূর্ত প্রতারক তথাকথিত 'স্বামী' 'মহারাজ' অমুকানন্দ তমুকানন্দদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকি। চালাকী দ্বারা আমরা কার্য সিদ্ধি করিতে চাই—এই পথে সহায়তার জন্য মানুষের demand আছে; এইসব বাবারা এই প্রয়োজনেরই supply অথবা সৃষ্টি। আমরা মনে করি এই বাবাদের কৃপায় আমরা ঘোরা পথে অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইব। সংসার যে একটি দুরতিক্রম্য নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার সাধ্য কোন 'বাবার' নাই এই বোধ আমাদের মধ্যে বহু বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরও নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় দুর্ধর্ষ আইন ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক জবরদস্ত শাসক ও রাষ্ট্রনেতা প্রভৃতি স্তরের ব্যক্তিরাও বাবাদের প্রসাদলাভের আসায় তাঁহাদের

স্বারস্থ। সমাজের শীর্ষস্থানীয় এইসব ব্যক্তিদের বাবাদের ভক্ত শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া সাধারণ লোকও মোহগ্রস্থ হয় ও বাবাদের ভক্তসংখ্যা স্ফীতি লাভ করে। ভুঁইফোড় বাবাদের অনেক প্রচারবিদ্ শিষ্য আছেন ইঁহাদের প্রচার কৌশল খ্যাতনামা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও হার মানাইয়া দেয়। আমাদের দেশের বিবেচনাহীন সংবাদপত্রগুলি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এই প্রচারের ফাঁদে ধরা পড়েন। ধনলক্ষ্মী, নেপালবাবা অথবা নিখাকীমার সংবাদ প্রকাশে চমক সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রচারের পূর্বে সংবাদের সত্যতা পরীক্ষিত হইলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইত না। এই সকল সংবাদ প্রচারের যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পাইয়াছিল সেই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রণোদিত হইয়াই আমাদের "জাতীয়" সংবাদপত্রগুলি নির্বিচারে "বাবাদের" মহিমা প্রচার করেন।

কিছুকাল পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় **ভবতোষ ঠাকুর** ও দেশ পত্রিকায় (শারদীয়া-১৩৬২) **স্বাস্তিক কবিতা** পরশুরামের এই দুইটি গল্পের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। কাহারা **ঠাকুরত্ব** লাভ করে এবং কাহারা ঠাকুরত্বলাভের উপায় এবং কাহারা ঠাকুরদের শিকার হয় এবং ব্যক্তিত্বহীন মেরুদণ্ডহীন এইসব শিষ্য-শিষ্যাদের অবস্থা আশ্রমগুলিতে কিরূপ এই গল্প দুইটি হইতে তাহা সুন্দরভাবে বুঝা যাইবে।

স্বার্থান্ধ দুষ্টের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফাঁদ পাতিবে ইহা জানা কথা, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ ও ভ্রান্ত জনগণকে এই বিপদ হইতে রক্ষার দায়িত্ব কি সমাজ ও রাষ্ট্রের নহে, সমাজ ও রাষ্ট্র যতদিন এ দায়িত্ব গ্রহণ না করিবে ততদিন পর্যন্ত বিরিঞ্চিবাবাদের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেই থাকিবে। ইহাই দুর্ভাবনার কারণ।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

সম্প্রতি বিশ্বভারতী থেকে জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি যথাযোগ্য সম্পাদকীয় টীকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে জগদীশচন্দ্রকে লেখা ছত্রিশখানি এবং অবলা বসুকে লেখা সাতখানি পত্র। পরিশিষ্টে আছে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিবন্ধ, অন্যের নিকট লিখিত পত্র, রবীন্দ্র-জগদীশের প্রশ্নোত্তর, রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ভগিনী নিবেদিতার পত্র। অতঃপর বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রভূত পরিশ্রম করে ১০৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী টীকা রচনা করেছেন। পরিশিষ্ট এবং টীকা রবীন্দ্র-জগদীশের সম্পর্কটিকে গভীর অন্তরঙ্গতায় এবং প্রায় চল্লিশ বৎসরের বন্ধুত্বকে অসামান্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে স্বভাবতই প্রবল আগ্রহ জন্মে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলি পড়তে। চিঠিপত্র প্রকাশের পরিকল্পনায় সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হবার অবকাশ অবশ্য ছিল না। গ্রন্থপরিচয়ে জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন পত্রের উল্লেখ থাকায় পাঠকের সেগুলি পড়ে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

২

এই চিঠিগুলি আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। দুটি অসাধারণ কালজয়ী প্রতিভা কি করে বন্ধুত্বের বন্ধনে ধরা দিল; আপন-আপন সাধনার নিরন্তর অনুসরণের মধ্যেও দুজনের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় হয়ে এসেছে, সে-কাহিনী আমাদের কাছে চিরকালের জন্য ঔৎসুক্য এবং শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে থাকল।

বিশেষতঃ নিঃসঙ্গতাই হচ্ছে বড়ো প্রতিভার ধর্ম। তাঁরা আপনার স্বপ্ন ও আদর্শের মধ্যেই মগ্ন। অগণিত মানুষের মধ্যে থেকেও তাঁদের যেন সঙ্গী নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির জীবনে এই নির্জনতা যেন আরো স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রজীবনীকার বারবার তাঁর এই নিঃসঙ্গতার উল্লেখ করেছেন। অসংখ্য কর্মের জালে জড়িয়েও একটা মুহূর্ত আসে যখন সেই জাল সরিয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। যৌবনকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক একটা আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন আবার নতুন কর্মপন্থার আহ্বানে তিনি সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। কাব্যপ্রেরণার দিক দিয়েও রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিবর্তনশীল নবীনতা রবীন্দ্রকাব্য পাঠককে বিস্মিত করে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি এক একটি স্তরকে এমনি করেই অতিক্রম করে গিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যকে পেরিয়ে এসে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সভ্যতার সঙ্কটের অন্তিম বাণীতে তিনি যুগান্তরণের স্বপ্ন দেখেছেন। এর মধ্যে কত নতুন সমস্যা, নতুন পরিবেশ তাঁর চিন্তাধারাকে শাণিত করে নিয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুজনেই প্রতিভার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খুঁটিনাটি কতদূর পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন বলা শক্ত। জগদীশচন্দ্রের

আবিষ্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবন্ধ লিখলেন 'জড় কি সজীব' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮, শ্রাবণ) এই প্রবন্ধ পড়ে জগদীশচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পদার্থ বিদ্যা বা উদ্ভিদ বিদ্যার নিছক বিজ্ঞানঘটিত তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক হয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বুঝতে পারা হয়তো সম্ভব ছিল না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি সুদূর ঐতিহ্যের ধারা দেখতে পেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র রয়েল সোসাইটিতে বক্তৃতার উপসংহার করেছিলেন এই বলে—

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns and shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the bank of the Ganges thirty centuries ago.*

এই উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষে যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি।" জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণের যে লীলা উদ্‌ঘাটিত হল, রবীন্দ্রনাথকে সেই তথ্যটিই মুগ্ধ করেছিল। ঋষিদের উপলব্ধ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হল, রবীন্দ্রনাথ যেন অতি সহজেই তখন তাঁর ঔপনিষদিক শিক্ষা এবং কবিদৃষ্টি নিয়ে জগদীশ-চন্দ্রের সত্যটি অন্তরে গ্রহণ করে নিলেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সত্য যেন একটা সৃষ্টি, অখন্ড চৈতন্যের প্রগাঢ় উপলব্ধি যা জড় এবং জীবনকে মৈত্রী বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল। রবীন্দ্র-নাথের ছিন্নপত্রেও এই উপলব্ধির কবিত্বময় প্রকাশ আছে—

যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শষ্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। (শিলাইদা ২০ আগষ্ট, ১৮৯২)।

রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনা দিয়ে এই চেতনার উপলব্ধি করেছেন, প্রায় সেই সময়েই জগদীশচন্দ্র গবেষণাগারে এই সত্যটিকে সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট। কবিজীবনের এই অধ্যায় এবং বৈজ্ঞানিক-জীবনের এই অধ্যায়টির মধ্যে ঐক্যই দুজনকে এমন নিবিড় বন্ধুত্বে বেঁধে দিতে সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়। এই সত্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বাণী। জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক হয়েও পরমাশ্চর্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় অভিষিক্ত। এই জন্যেই তাঁর বাংলা রচনা এমন শিল্পস্পর্শে প্রদীপ্ত। বস্তুকে শুধু বস্তুরূপে দেখেননি বলেই তাতে যন্ত্র হয়েছে কল্পনার আভা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্বপরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুরোরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।**

এই উক্তি বন্ধুত্বজনিত প্রশস্তি মাত্র নয়, জগদীশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তাঁরাই সে-কথা জানেন। সুতরাং তাঁদের বন্ধুত্বে সহায়তা করেছিল দুজনের মননচেতনার সাদৃশ্য। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিকসুলভ বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাঁর অধ্যাত্ম

* চিঠি পত্র ৬ পৃ ১১১

** চিঠি পত্র ৬ পৃ ৭০

উপলব্ধির অখন্ডতাকে কোনো দিক দিয়েই ক্ষুন্ন করেনি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি সত্যই অর্থগভীর—

ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে।*

৩

I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality.**

নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কাব্যসমালোচকদের কাছে বিশেষ কৌতূহলো-দ্দীপক হবে। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বলে শুধুই আবেগপ্রবণ ছিলেন, এমন কথা বলা তাঁর সমগ্র বিচার নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনী অনুধাবন করলে তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়বে। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "বালক-বয়সেই রবীন্দ্রনাথ যে ভাবুকতা, চিন্তা ও বিচারশক্তির (critical faculty) পরিচয় দিয়াছিলেন—সেকালে যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ ও আলোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ছিল।...ষোল বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ বৎসর—এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা ও লিখিত প্রবন্ধ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে এই প্রতিভার আদি-উন্মেষ কোন পথে হইয়াছে। বাস্তবিক এত অল্প বয়সে মানস-শক্তির (intellect) এমন জাগরণ কবিজীবনে অতিশয় বিরল।†" এই মানসশক্তি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রূপে বিকাশ লাভ করেছে। কবিতাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছে মানসচেতনার নিত্যনবরূপে। সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা সাহিত্য—সব কিছুর আলোচনাতেই তার প্রমাণ অক্ষুন্ন। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই আদর্শবাদিতায় পূর্ণ ছিল কিন্তু যুক্তি এবং বিশ্লেষণে কখনই তিনি অস্পষ্ট ছিলেন না। তিনি শব্দতত্ত্ব লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' লিখেছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বজনশ্রুতেয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিকে চিন্তায় অপূর্ব স্বচ্ছতা এসেছিল। পূর্ববর্তী যুগের বাকালঙ্কারের পঙ্কিল তিনি পরিহার করলেন। তিনি লিখলেন বিশ্বপরিচয় এবং বাংলা ভাষাপরিচয়। এই সময়েরই লেখা তিনসঙ্গীতে সংকলিত গল্পগুলির নায়কদেরও তিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় প্রতিভাবানরূপে কল্পনা করেছেন।

এটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। লিওনার্তো দা ভিঞ্চি এবং গ্যেটের সঙ্গে এই দিক দিয়ে তাঁর মিল। কিন্তু অনুরূপ আর বেশী নেই। কল্পনা ও মননের যুগ্মধারার প্রতিভা সত্যই বিরল। এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল বলেই এই নিঃসঙ্গ কবির বৈজ্ঞানিকের বন্ধুত্ব অর্জনে বিলম্ব হয় নি।

৪

সেই যুগটাও স্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ঘটল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্ভবতঃ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।* রবীন্দ্রকবিজীবনে তখন চিত্রা-কথা-কল্পনার

* চিঠিপত্র, ৬ পৃ ১২২

** পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১২৮ ক

† কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য (১ম খন্ড) পৃ৩৫-৩৬

* চিঠিপত্র ৬ পৃ ১৫৫

যুগ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশের ঘরে। জগদীশচন্দ্র চলেছেন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনের পথে আর রবীন্দ্রনাথের তখন মধ্যাহ্নপর্ব আরম্ভ হয়ে গেলেও তেমন সর্বপরিচিত হননি। তখনও রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কার্যে ব্যাপৃত, ব্রাহ্মধর্ম আলোচনায় উৎসাহী। রাজনীতি নিয়ে ও দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় নিরত।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার আদর্শের দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িক আন্দোলন থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র ছিলেন না। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব রবীন্দ্রনাথের কবিস্বপ্নকে আচ্ছন্ন করেছে। ভারতবর্ষের যে নিজস্ব পথ ও আদর্শ আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে য়ুরোপীয় মদমত্ত সভ্যতার উপরে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্য ছাড়াও পূর্ববর্তী অন্যান্য কাব্যেও প্রাচীন ভারতের শান্তিময় গৌরবমণ্ডিত জীবন সৌন্দর্যপ্রভা বিকীর্ণ করেছিল। সে- সময়কার প্রবন্ধ ইত্যাদিতেও একই সুর ধ্বনিত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ত্যাগের বাণী ও অধ্যাত্ম মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই ঐতিহ্যবোধ এবং জাতীয় আদর্শ বল সঞ্চয় করছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভারতসংস্কৃতির বাণী প্রচারে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকের ইতিহাস-চিন্তায়। ভগিনী নিবেদিতা উদাত্ত ভাষায় লিখেছেন,

I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,—a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanisads & pronounced it one shall again survey the vast accumulations of physical phenomena.....*

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make out one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,—we shall lose our chance for ever and deserve to lose it.†

জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যে সব পত্র লিখেছিলেন তাতে এই আদর্শকেই বার বার উচ্চারিত হতে শুনি—

ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন।*

এই ভাষাতে এবং এই আদর্শে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরে প্রেরণার আগুন জ্বালতে চেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রও বলেছেন 'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে।' তাঁর সাধনা যে ভারত-সংস্কৃতিরই বিকাশের ধারায় এসেছে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জগদীশ-

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৫২
† পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৪৫
* পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৩

চন্দ্রকেও তাই তিনি এই গুরুভার বহন সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনা ব্যক্তির নয়, জাতির। এই আদর্শের দীপ্তিতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। জগদীশ-চন্দ্রের দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় রাজার দাক্ষিণ্য ছিল অকুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এমন প্রস্তাবও করেছিলেন, গভর্ণমেণ্ট যদি জগদীশচন্দ্রকে ছুটি না দেয়, তবে তিনি যেন সরকারী কাজ ছেড়ে দেন; তাঁর ব্যয়ভার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সুহৃদ্‌গণই বহন করবেন। এই আশ্চর্য সৌহৃদ্যের প্রতিদানে জগদীশচন্দ্রও বন্ধুকে বিশ্বের গুণিসমাজে পেঁাছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন—

তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? *

তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন তাঁর সম্বর্ধনাসভায় জগদীশচন্দ্রই হলেন সভাপতি। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে সংক্ষিপ্ত সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন, বর্তমান গ্রন্থে তার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৭-এ জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত দুজনের বন্ধুত্ব অনাবিলপ্রেক্ষ আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দুজনের পত্রসংখ্যা বেশি নয়। প্রথম যুগের সেই আদর্শবাদ তাঁদের পত্রে আর নেই। এর কারণ বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এবং দেশের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার সঙ্গে যে যোগ রক্ষা করে চলতেন, জগদীশচন্দ্র বোধহয় সে-রকম সক্রিয় যোগ রাখতেন না; সম্ভবতঃ এই জন্যই তাঁদের চিঠিতে এই অভিমত-বিনিময় নেই। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন

রবীন্দ্রনাথের সহিত জগদীশচন্দ্রের যে নিবিড় যোগ এককালে ছিল তাহার কথা আমরা এই জীবনীমধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ক্রমে কালের ব্যবধানে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা হেতু দুই-জনের মধ্যে পূর্বের সে নিবিড়বন্ধন শিথিল হইয়া যায় তৎসত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। *

জগদীশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর বসুবিজ্ঞানমন্দিরে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে (৩০ নবেম্বর) রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি বক্তৃতায় প্রথম বক্তৃতা দেন। সেই ইংরেজি বক্তৃতাটি চিঠিপত্রের ৬ষ্ঠ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেটি পড়লে বোঝা যায় কত সুন্দর ছিল বন্ধুত্ব।

ভবতোষ দত্ত

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৭৫
* রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড) পৃ ১০৪